দক্ষিণ ভারতে

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
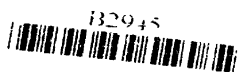
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দক্ষিণ ভারতে

(১)

এতদিনকার ভ্রমণ উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার দক্ষিণের ডাক আসিল। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সাধনপীঠে সর্বজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্যোগ করিবার জন্য যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করিয়া সম্মেলনের সভাপতি বন্ধুবর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, অনুরোধ করিলেন আমাকে যোগ দিতে হইবে। প্রতিবন্ধক ছিল; সংবাদপত্রে যাহারা কাজ করে তাহাদের প্রতিবন্ধক থাকাটাই স্বাভাবিক; তথাপি সম্মত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের মানবদেহে অবস্থানকালে তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া উঠে নাই, দেখিতে যাইবার উদ্যোগ করিয়াও ঠেকিয়া গিয়াছে; এইবার অন্ততঃ তাঁহার সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আসিবার সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। তাহা ছাড়া দক্ষিণ দেশ দেখিবার আকর্ষণ তো ছিলই। যাওয়া স্থির করিবার পূর্বে জননীকে সমস্ত জানাইয়া অনুমতি লইলাম, বলিলাম এই যাত্রাপ্রসঙ্গে এবার কাবেরী-স্নান ও রামেশ্বর-সেতুবন্ধ-দর্শন সারিয়া লইব; আসিবার সময় কাবেরীর জল লইয়া আসিব; মা বলিলেন, 'সেতুবন্ধের মাটি আনিতে ভুলিও না, উহাতে শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর পদধূলি রহিয়াছে।' এ তো আমার পক্ষে আনন্দের কথাই।

যাত্রার লক্ষ্য

কাবেরী-স্নান এবং সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-দর্শন—এই দুইটি লক্ষ্যে রাখিয়াই যাত্রার প্রারম্ভ। যে পুণ্যতোয়া নদী-সপ্তকের স্মরণ আমাদের সকল ধর্মকার্যের প্রারম্ভিক অঙ্গ তাহাদের মধ্যে গঙ্গা প্রথম এবং কাবেরী সর্বশেষ—সর্বোত্তর হইতে সর্বদক্ষিণ। গঙ্গা গৃহদ্বারে, কাবেরী বহু দূর। তীর্থযাত্রী হিসাবে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের যে চারি ধাম অবশ্য-দর্শনীয় তাহাদের মধ্যে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরও সর্বদক্ষিণ এবং বহু দূর। সম্ভবতঃ এই জন্যই এই দুইটির কথা বিশেষভাবে মনে উঠিয়া থাকিবে। ইহার সঙ্গে কন্যাকুমারীর কথাও মনে হইয়াছিল। তবে তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না। দক্ষিণে যাইতেছি। সর্বপ্রান্ত-ভূমিতে যেখানে তিন সমুদ্র সম্মিলিত হইয়া এই পূণ্যভূমির পদমূলে নিত্য অঞ্জলি দিতেছে তাহা দেখিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল বটে। এই কয়টী উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়াই দ্রুত ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; এই প্রসঙ্গে অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ ক্রমশঃ তালিকার সহিত যুক্ত হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে যেমন পথ ফুরায়, তেমন চলিবার আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে; ভ্রমণের সাথে সাথে নূতন নূতন ভ্রমণ-কল্পনাও দেখা দেয়।

দ্রুত ঘুরিয়া আসিতে হইবে, বিমানভ্রমণ ছাড়া উপায় নাই। নদীয়া সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধনে আহূত হইয়া শনিবার ২১শে এপ্রিল * কৃষ্ণনগরে যাইতে হইয়াছিল। ২২শে রবিবার অপরাহ্নে ফিরিয়াই নৈশ—বিমানযোগে দক্ষিণে রওয়ানা হইলাম। বিমানে

* ১৯৫১

মাদ্রাজ, তাহার পর মোটরে পণ্ডিচেরী। নৈশ-বিমান ভ্রমণে বর্ণনীয় বিশেষ কিছু নাই। আধ-ঘুম, আধ-জাগরণ অবস্থায় ঈষৎ শায়িত অথচ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। অবরুদ্ধ অথচ স্বচ্ছ গবাক্ষপথে মধ্যে মধ্যে আকাশ দর্শন। নিবিড় অন্ধকারে তারার ঝিকমিকি। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পথে নাগপুরে নামিয়া জাহাজ বদল করিতে হইল। নাগপুর নৈশ-বিমান ভ্রমণে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিমানপথের সংযোগ-কেন্দ্র। এই কয়টি স্থান হইতে জাহাজ নাগপুরে আসিয়া একত্র হয় এবং যাত্রী-দিগকে জাহাজ বদল করিতে হয়।

বিমান হইতে সূর্যোদয় দর্শন

নাগপুর হইতে মাদ্রাজের জাহাজ ছাড়িল রাত্রি ৩টা—৩॥টায়। তখন হইতে একটু উদ্‌গ্রীব হইয়াই বসিয়া রহিলাম। মাদ্রাজ যাইতে সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হইবে এবং সমুদ্র-সীমায় পৌঁছিতে পৌঁছিতেই ভোর হইয়া আসিবে। সমুদ্রে সূর্যোদয় মনোরম দৃশ্য এবং বহুকাম্য দৃশ্য। বিমান হইতে সমুদ্রে সূর্যোদয় দর্শন অধিকতর কাম্য। বিমান দক্ষিণমুখে চলিতেছে। বামদিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু রাত্রি ভোর হইয়া আসিলেও অরুণোদয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং মনে হইতে লাগিল অন্ধকাররাশি যেন পূর্ব দিকসীমায় জমাট বাঁধিয়া এক অনন্তপ্রসারিত বিশাল ও উচ্চ প্রাচীর রচনা করিয়াছে এবং তাহারই ছায়া যেন সমতল ভূমির উপর অনেক দূর প্রসারিত

হইয়া আসিয়াছে। ঠিক করিয়া কিছু উপলব্ধি হইতেছিল না ইহা কি। কখনও মনে হইল গিরিমালা, কখনও মনে হইল ঘন-সন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণী। পরক্ষণেই ভাবিলাম এমন নিবিড় ও সুদূর-প্রসারিত গিরিমালা বা তরুরাজীই বা এখানে কোথা হইতে আসিবে? যাহাই হউক, সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্যোদয় দেখা অদৃষ্টে ঘটিল না। পুঞ্জীভূত অন্ধকারস্তূপের অন্তরাল হইতে ক্রমশঃ প্রভাতের আলো ছড়াইয়া পড়িল। দেখিলাম সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়াছি; পূর্বদিগন্তে যত দূর দৃষ্টি যায় স্তূপীকৃত কৃষ্ণ মেঘ দিক-সীমায় নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ছায়া সমুদ্রবক্ষের উপর প্রসারিত হইয়া তাহাকেও যেন আপনার সহিত এক করিয়া লইয়াছে। আকাশে মেঘের স্তূপ এবং সমুদ্রের জলে প্রসারিত মেঘের ছায়া অন্ধকারের সহিত মিশিয়া এতক্ষণ এমন এক বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল—যাহার রহস্য ভেদ করা মানব-দৃষ্টি বা মানব-বুদ্ধির সাধ্য ছিল না। মেঘপ্রাচীরের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্যদেব যখন দেখা দিলেন তখন রক্তিমাভা কাটিয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ বিমানঘাটিতে যখন পৌঁছিলাম তখন বেশ একটু বেলা। যাঁহারা লইতে আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, আর ছিলেন কলিকাতার পূর্বপরিচিত জনৈক বন্ধু। প্রথম আলাপেই তাঁহাদিগকে জানাইলাম দক্ষিণ ভ্রমণে আমার মনোগত অভিপ্রায় এবং জননীর নির্দেশ; তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম পণ্ডিচেরী হইতে কাবেরী-স্নানে ও সেতুবন্ধ-দর্শনে যাইবার পথের সহিত তাঁহাদের পরিচয় আছে

কিনা। সৌভাগ্যক্রমে উভয়েরই জানা ছিল। বন্ধুটি স্থানীয় ভদ্রলোকটির সহিত আলোচনা করিয়া বলিলেন,—পণ্ডিচেরী হইতে কাবেরী প্রায় শতখানেক মাইল দূর ; সর্বাপেক্ষা সন্নিকটে কাবেরীতে পৌঁছানো যায় মায়াভরমে। কিন্তু সেখানে নদীর অবস্থা যেরূপ তাহাতে স্নান হইবে না, স্পর্শমাত্রই সম্ভব হইবে। ক্রমাগত বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধিয়া কাবেরীর জল আটক করার ফলে শেষের দিকটাতে আসিয়া নদীতে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ খাল ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নাই। সুতরাং কিঞ্চিৎ দূরবর্তী হইলেও ত্রিচী অর্থাৎ ত্রিচিনপল্লীতে যাইতে হইবে। তথায় নদীতে তবু স্নানের উপযুক্ত কিছু জল আছে। সেতুবন্ধ যাইবার পথের পরামর্শ এখানে হইল না। পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়াই সে পরামর্শ করা ভালো বলিয়া সাব্যস্ত হইল। চাই কি তথা হইতে কোনো সঙ্গীও মিলিয়া যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে তথায় নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে সাথী মিলিয়া যাওয়াই সম্ভব।

মাদ্রাজ

বিমানঘাটি হইতে মোটরে সহরের দিকে রওয়ানা হইলাম। সহরে পৌঁছিতে অনেকটা পথ যাইতে হয়, উঠিবার স্থানটি আরও কিছু দূর। পথে মাদ্রাজ সহরটা মোটামুটি দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিল। ভারতের প্রায় দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রকূলে আসিয়া পড়িয়াছি। কেবলি মনে হইতেছিল —"তমালতালীবনরাজীনীলা।" আগ্রহাকুল দৃষ্টি স্বভাবতঃই

নিযুক্ত হইল সেই দৃশ্যের সন্ধানে। উদ্ভিদের সমারোহ প্রচুর, তাহার মধ্যে তালীবৃক্ষের সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু তমালের চিহ্নমাত্র নাই, তাহার পরিবর্তে আছে "Rain tree" অর্থাৎ "বর্ষণ বৃক্ষ" নামে পরিচিত ঘনপল্লবময় বৃক্ষের প্রাচুর্য। সহরের একটিমাত্র বৃহৎ রাজপথ 'মাউন্ট রোড' হইয়া, যে mount বা পাহাড় হইতে উহার নামকরণ তাহা দেখিয়া, নগর-প্রণালী অতিক্রম করিয়া, ডাঃ বেশান্তের আদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরের অন্যান্য বিশিষ্ট স্থান ও ভবনসমূহ বাহির হহতে দেখিয়া লইয়া উপস্থিত হইলাম সুবিখ্যাত কনেমারা হোটেলে। তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর। এই যাত্রায় তিনিই আমাদের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত। হোটেলে আলাপ সারিয়া আমাদের গন্তব্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটির বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বিপ্রহরের বিমানে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সদলে কলিকাতা হইতে পৌঁছিবেন। কথা রহিল তাঁহার সহিত একত্রে পণ্ডিচেরী রওয়ানা হইব। মাদ্রাজ সহরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বন্ধুটির সহিত আলাপে যাহা জানিলাম তাহার মধ্যে একটা কথা বড় মনে লাগিল, উল্লেখ করিতেছি। সহরের মিউনিসিপ্যালিটী চালাইতে নিম্নতর বৃত্তির যে সকল কাজ করিতে হয় তাহার জন্য, কলিকাতার মতো, প্রদেশের বাহির হইতে লোক আনাইতে হয় না। পথ পরিষ্কার, ময়লা অপসারণ প্রভৃতি কাজের জন্য স্থানীয় লোকই পাওয়া যায়।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারিয়া পুনরায় বিমানঘাটির দিকে

রওয়ানা হইলাম। পথে "হিন্দু" পত্রিকার আফিস দেখিয়া ও উহার পরিচালক শ্রীকস্তুরী শ্রীনিবাসনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিমানঘাটিতে পৌঁছিলাম। অল্প পরেই বিমানে করিয়া পৌঁছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁহার সহিত ডাঃ কালিদাস নাগ, টিসলার নামে জনৈক মার্কিণী এবং টিসলারের সহিত শ্যাম দেশের এক মিলিটারী অফিসারের বালক পুত্র। বিমানঘাটি হইতেই আমরা সোজা পণ্ডিচেরী রওয়ানা হইলাম, ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের সহিত এক গাড়ীতে টিস্‌লার ও আমি, অপর একটি বৃহত্তর গাড়ীতে বীরেন্দ্রকিশোর ও ডাঃ নাগ; তাঁহাদের সহিত রহিল আমাদের মালপত্র; মালপত্র সামান্য, আমার সহিত মাত্র একটি মাঝারি স্যুটকেস, তাহার মধ্যেই আচ্ছাদন ও যৎসামান্য বিছানা। আমাদের গাড়ী অগ্রে, বৃহত্তর গাড়ীটা পশ্চাতে।

পণ্ডিচেরী অভিমুখে

মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরী ১০০ মাইল। রেলে যাইতে বড় লাইনের ভেলুপুরম স্টেশনে নামিয়া শাখা লাইনে যাইতে হয়। মোটরের পথ অতি চমৎকার, মোটর চলেও উর্ধ্ববেগে, স্থানে স্থানে ঘণ্টায় ৬০ মাইল। ভ্রমণের প্রথম অংশে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ী চলিতেছে, তাহারই মধ্যে যতটুকু সম্ভব চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইতে লাগিলাম। বামে সমুদ্র এবং দক্ষিণে পুর্বঘাট গিরিমালা, তাহারই মধ্য দিয়া চলিয়াছি; স্থানে স্থানে সমুদ্র সন্নিকটে আসিয়া পড়ে। পথের দুই দিকেই প্রশস্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র; প্রান্তরের মৃত্তিকা দেখিতে ঘোর রক্তবর্ণ, বর্ধমানের

রাঙ্গা মাটীও হার মানিবে। তরুশোভা মাদ্রাজের মতই—তালীবৃক্ষই প্রধান। মাদ্রাজ সহরের দক্ষিণ হইতে তামিল রাজ্যের প্রারম্ভ। ইহারই উপকূল ভাগের বর্ণনায় কালিদাস দূরদর্শনে বলিয়াছেন—"তমালতালীবনরাজীনীলা" এবং নিকট-দর্শনে বলিয়াছেন—"কূলং ফলাবর্জিত পূগমালম্"—ফলভরে অবনত সুপারী গাছে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তালীবৃক্ষ অনেক দেখিলাম কিন্তু তমাল দেখি নাই; পথে যাইতে সুপারী গাছ একটিও চোখে পড়িল না। প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কালিদাসের ন্যায় প্রকৃতির নিপুণ দ্রষ্টা কবি কি ভুল করিয়াছেন?

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যখন বসতির মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন আমাদের পিছনের গাড়ী দেখা যাইতেছে না। রওয়ানা হইবার সময়েই স্থির হইয়াছিল, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে—দুই গাড়ী একত্র হইয়া পুনরায় রওয়ানা হইবে। স্থানটিতে আসিয়া আমরা থামিলাম এবং গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইতে লাগিলাম। স্থানটি ছোট খাটো বাজার। বিক্রীর দ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—ফুল, পান, ও কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কোয়া ভাগা দিয়া সাজানো রহিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাঁঠালের স্থানীয় নামটি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এখানে আমরা অপেক্ষা করিলাম অনেকক্ষণ; কিন্তু তাহার পরেও যখন দ্বিতীয় গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল না তখন পুনরায় রওয়ানা হওয়াই স্থির হইল। রওয়ানা হইয়া আসিয়া ঠেকিলাম ভারত ও ফরাসী ভারতের সীমান্তে। এখানে ফরাসী ভারতের শুল্কবিভাগ আমাদের

আটক করিলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ শুল্ক কর্মচারীদের সহিত আলাপ করিতে গেলেন, সেই অবসরে উত্তপ্ত মোটর হইতে নামিয়া পথপার্শ্বে এক বিশাল তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলাম। স্থানীয় লোকজনের সহিত আলাপেরও একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

শুল্ক-সীমায়

পণ্ডিচেরী অঞ্চলে ভারত ও ফরাসী ভারতের মধ্যে সংযোগের একটা বিশেষত্ব আছে যাহা সাধারণের জ্ঞাত নহে। ফরাসীর অধীন অঞ্চল এক লপ্তে নহে, কয়েকটা খণ্ডে ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে ছড়ানো; উহারই একখণ্ডে পণ্ডিচেরী সহর; আমাদের ধারণা ভারত হইতে আমরা সরাসরি পণ্ডিচেরীতে ফরাসী ভারতে প্রবেশ করি এবং পণ্ডিচেরীর সীমা ছাড়াইলেই ভারতে আসিয়া পড়া যায়। কিন্তু কার্যতঃ দেখিলাম তাহা নহে। পণ্ডিচেরীর পূর্বেও ভারতের মধ্যে এক খণ্ড ফরাসী ভারত আছে। পণ্ডিচেরী যাইতে প্রথমে ভারত হইতে ফরাসী ভারতের এই খণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পর পুনরায় ভারত, তাহার পর প্রবেশ করিতে হয় পণ্ডিচেরীতে। উত্তর বা দক্ষিণ যে দিক দিয়াই পণ্ডিচেরীতে আসা যাক এই অবস্থা। দুই দফায় ফরাসী রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয় বলিয়া শুল্ক-পরীক্ষা হয় দুইবার। ইহা এক ঝঞ্ঝাট-বিশেষ, কিন্তু ইহা হইতে অব্যাহতি নাই।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ রাস্তার অপরদিকে শুল্ক অফিসে গিয়াছেন,

সঙ্গে গিয়াছেন টিসলার প্রভৃতি। একা তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া স্থানীয় লোকজনের কাজকর্ম লক্ষ্য করিতেছিলাম। একটি কিশোর ও একটি কিশোরী মুখোস লাগাইয়া নৃত্য করিতেছিল—মনে হইল সন্নিহিত গ্রামে কোনো পূজাপার্বণের উৎসবের ব্যাপার। অপরিচিত দর্শক পাইয়া তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত নৃত্য দেখাইতে লাগিল, কিছু পুরস্কার লইয়া থামিল। ইতিমধ্যে টিসলার আসিয়া পৌঁছিলেন; রাস্তার ওপার হইতে তিনি ইহাদের নৃত্য দেখিয়াছিলেন, আসিয়া বলিলেন আমি এই পল্লী-নৃত্য দেখিতে চাই। তুমি উহাদের আবার নাচিতে বল। বলিলাম, কিন্তু তাহারা বুঝিল না। এ রাজ্যে রাষ্ট্রভাষা অচল সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরেজীও অচল, সুতরাং হাতের ফাঁকি ও মুখের ভঙ্গীই একমাত্র অবলম্বন। তাহাও যখন ব্যর্থ হইল সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে একজন লোক আসিয়া পৌঁছিল যাহার দুই একটী ইংরেজী শব্দ জানা ছিল। তাহাকে বলিলাম Dance (নাচ)। কথাটি তাহার বোধগম্য হইল এবং তাহার নির্দেশে কিশোর-কিশোরী পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। নৃত্যশেষে টিসলার তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন জনপ্রতি এক টাকা। পুরস্কারটা বোধ হয় আশার অতিরিক্ত হইয়াছিল—তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই গ্রাম হইতে দলবদ্ধ নর্তক ও নর্তকী ছুটিয়া আসিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়িয়া দিল, মুখে তাহাদের রাম, রাবণ প্রভৃতির মুখোস। নৃত্য চলিতে চলিতে শুল্ক-পরীক্ষা মিটাইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া নর্তক-

নর্তকীর দল টিসলারকে ছাড়িয়া তাঁহাকেই ঘেরাও করিল—ভাবটা এই রকম—আপনাকেই দলপতির মতো দেখাইতেছে, পূর্বের নৃত্যশিল্পীরা যে পুরস্কার পাইয়াছে আমাদের তাহা অপেক্ষা বেশী দিতে হইবে কারণ আমরা বেশী নৃত্য দেখাইয়াছি। পুরস্কার তাহাদের দেওয়া হইল কিন্তু মুখের ভাব ও কলরব হইতে মনে হইল তাহারা সন্তুষ্ট নহে, যোগ্যতা ও প্রদর্শনীর উপযুক্ত পুরস্কার তাহাদের মেলে নাই।

এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামিতে হইয়াছিল। পশ্চাতের গাড়ী এখনও আসিয়া পৌঁছিল না। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সকলের মনে একটা উৎকণ্ঠার ভাব। সেই উৎকণ্ঠা লইয়াই আমরা রওয়ানা হইলাম। ফরাসী রাজ্য হইতে পুনরায় ভারত এবং পুনরায় শুল্ক-সীমারক্ষকদিগের পরীক্ষা পার হইয়া পণ্ডিচেরীতে প্রবেশ করিলাম। প্রত্যেক শুল্ক অফিসেই বলিয়া রাখা হইল আমাদের মালপত্র লইয়া গাড়ী পশ্চাতে আসিতেছে। তাহা যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শুল্ক-পরীক্ষকেরা রাজী হইল। অরবিন্দ আশ্রম ভবনে যখন উপস্থিত হইলাম তখন অপরাহ্ন ৫॥টা। তখনও আমাদের দ্বিতীয় গাড়ী আসিয়া পৌঁছে নাই। আশ্রম-ভবনের দ্বার হইতেই শ্রীচারুব্রত ভট্টাচার্য আমাদিগকে লইয়া শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য সোজাসুজি ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে চলিয়া আসিলেন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই মন ভরিয়া উঠিল। পণ্ডিচেরী আশ্রমের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমি

কেবল ভ্রমণের সূত্র অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণটির বিশেষত্ব উল্লেখ করিতে হইবে। সমুদ্রের বেলাভূমির উপর হইতে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণটি অর্ধচন্দ্রাকারে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। প্রাঙ্গণে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া খেলিতেছে আর সম্মুখে অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের নীল জলরাশি অবিরাম তরঙ্গভঙ্গে প্রাঙ্গণভিত্তির পদ-মূলে আসিয়া পড়িতেছে। অপূর্ব দৃশ্য, অবিস্মরণীয় দৃশ্য! একদিকে সমুদ্রের ক্রীড়া, অপরদিকে জীবনের ক্রীড়া—উভয়েরই বিকাশ অবিরাম, তরঙ্গময় এবং নিত্য-নূতন। মনে হইল এই পটভূমিকায় যাহারা মানুষ হইবে তাহাদের শরীর-মন আপনিই একটা বিরাটের অনুভূতিতে দিব্যভাবে ভরিয়া উঠিবে। মনে হইল নূতন মানুষ যদি গড়িতে হয় তবে সে গঠনের জন্য এই পরিবেশই গ্রহণীয়।

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার হইতে প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে ক্রীড়ারত এক প্রবীণার মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। বয়স বার্ধক্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু শরীরের গতি বা ভঙ্গী তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সামান্য একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র—মুখে একটা অপূর্বশ্রী—চতুর্দিকে এমন একটা জৌলুস যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচয় না পাইলেও মনে মনে বুঝিয়া লইলাম ইনিই শ্রীমা—শ্রীঅরবিন্দের শক্তি। সামান্য আলাপের পর ফিরিলাম। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ শ্রীদিলীপ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল আশ্রমের অতিথিশালায় গোলকুণ্ডা ভবনে। ভবনটির

গঠনবৈচিত্র এবং পরিচালনের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র।

বাসা পাইলাম বটে, কিন্তু বিপদ হইল, মালপত্র লইয়া দ্বিতীয় গাড়ী তখনও পৌঁছে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অগত্যা চারুবাবুর নিকট হইতে বস্ত্রাদি লইয়াই স্নান সারিতে হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আশ্রম হইতে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্যারেড গ্রাউণ্ডে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। অপেক্ষা করিয়া সময় গিয়াছিল বলিয়া যাইতে বিলম্ব হইল। প্যারেড গ্রাউণ্ডে যখন পৌঁছিলাম তখন প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা-সমাপ্তির পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমরা শ্রীমাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনান্তিক প্রসাদ লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইলাম। প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই অনুষ্ঠান আশ্রম জীবনযাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং বিশেষভাবে বর্ণনীয় কিন্তু তাহারও স্থান এখানে নাই।

প্যারেড গ্রাউণ্ড হইতে গোলকুণ্ডা ভবন—তথা হইতে ভোজনশালা এবং ভোজন সমাপ্ত করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের গৃহে—ইহাই সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনা। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পরদিন সর্ব-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্বোধনসভার কর্মসূচী নির্ধারণ ও প্রস্তাব রচনা। অন্যান্য অনেকেও আসিয়াছিলেন। কাজ মিটাইতে প্রায় রাত্রি ৯॥টা-১০টা হইল। তখনও ডাঃ নাগ এবং বীরেন্দ্রকিশোরকে লইয়া দ্বিতীয় গাড়ী আসিয়া পৌঁছে নাই।

উৎকণ্ঠা গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধান লইবার ব্যবস্থা করা হইল। গোলকুণ্ডাভবনে ফিরিয়া উৎকণ্ঠার সহিত শয্যা গ্রহণ করিলাম। অধিক রাত্রে দ্বারে আঘাতের শব্দে উঠিয়া শুনিলাম নীচে আমাদের মালপত্র আসিয়াছে, দেখিয়া লইতে হইবে। নীচে গিয়া দেখিলাম ফরাসী পুলিশ মালপত্রগুলির সঙ্গে আসিয়াছে। বুঝিলাম মালপত্রের জন্যই দ্বিতীয় গাড়ীর দুর্ভোগ হইয়াছে। আমাদের বাক্সগুলি ছিল চাবিবন্ধ অথচ শুল্ক-পরীক্ষকেরা ভিতরে কি আছে তাহা না দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে মালিকের স্বীকৃতি না লইয়া ছাড়িবে না। ইহাতেই গাড়ী আটক হইয়া রহিয়াছে। আমরা যে পথে শুল্ক আফিসে স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছিলাম দ্বিতীয় গাড়ী সে পথে না আসিয়া অন্যপথে আসিয়াছে, দুর্ভোগের মূল কারণ ইহাই। পথে যেখানে উভয় গাড়ী একত্র হইবার জন্য আমরা প্রথমে থামিয়াছিলাম—সেইখান হইতেই দ্বিতীয় গাড়ী অন্য পথে গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সমস্ত জানিয়া ও ব্যক্তিদের পরিচয় পাইয়া এইটুকু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাঁহারা গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে পুলিশ দিয়াছেন—বাক্স খোলাইয়া দেখিয়া এবং মালিকের স্বীকৃতি লইয়া তবে মাল ছাড়িবে। তাহাই করা হইল। বাক্স খুলিলাম—পরীক্ষার বা দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না—একটা বড় শিশিতে ছিল গঙ্গাজল। তাহা মুহূর্তের জন্য সন্দেহ উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ নিরসিত হইল। পুলিশ ছাড়িল। আপনার মালপত্র বুঝিয়া পাইয়া পুনরায় শয়ন করিতে গেলাম।

দৈববাণী

রবিবার রাত্রি হইতে সোমবার পর্যন্ত প্রায় পণ্ডিচেরী পৌঁছিতেই কাটিয়া গেল। মঙ্গলবার ও বুধবার বৈকাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে অবস্থান। এই দুই দিনে পণ্ডিচেরীর বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করিয়াই আমার বক্তব্যের মূলধারা অনুসরণ করিতে হইবে। যাঁহাদের সহিত গিয়াছিলাম তাঁহারা জানিতেন যে, পণ্ডিচেরী হইতে আমার দক্ষিণে যাইবার ইচ্ছা। পণ্ডি-চেরীতে পৌঁছিয়া আশ্রমের কর্মীদিগকেও জানাইয়াছিলাম ; বিশেষ উদ্দেশ্য, যাইবার পথটা যথাসম্ভব জানিয়া লওয়া এবং পূর্বে এইদিকে গিয়াছেন এমন কোন সঙ্গী সংগ্রহ করা। যা হয়, কোনরূপ একজন সঙ্গী পাইলেই হয়। যাইব স্থিরই করিয়া-ছিলাম, তথাপি এই দূরদেশে একা সম্পূর্ণ অপরিচিত পথযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে কেমন ইতস্ততঃ বোধ হইতেছিল।

মঙ্গলবার পণ্ডিচেরীতে যুগ্ম অনুষ্ঠান। ২৪শে এপ্রিল, আশ্রমে শ্রীমার প্রথম আগমন-দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠান। তাহার সহিত মিলিয়াছে সর্বজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্বোধন। প্রাতে শ্রীমায়ের অলিন্দ হইতে দর্শন দান ; তৎপরে উপস্থিত সকলের শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। আশ্রম-বাসীদের শ্রদ্ধানিবেদনের অনুষ্ঠানটি অনেকটা সামরিক ধরণের। ইহার সম্বন্ধে জানিবার এবং বলিবার কথা আছে। সমাধির উপর সু-উচ্চ বেদী নিবিড় তরুচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত—শান্ত, স্নিগ্ধ ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ পরিবেশ। সন্ধান লইয়া জানিলাম সমাধিগর্ভে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরশিরে শায়িত। সমাধিতে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের পর

দ্বিতলে উঠিয়া শ্রীঅরবিন্দের বাসকক্ষ দর্শন ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ, আশীর্বাদের সহিত দিলেন একটি মুদ্রিত পত্র, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত গ্রন্থ মহাকাব্য 'সাবিত্রী' হইতে উদ্ধৃত অংশবিশেষ—

"A day may come when she must stand unhelped
On a dangerous brink of the world's doom and hers
Carrying the world's future on her lonely breast,
Carrying the human hope in a heart left sole
To conquer or fail on a last desperate verge
Alone with death and close to extinction's edge
Her single greatness in that last dire scene.
She must cross alone a perilous bridge in time
And reach an apex of world-destiny
Where all is won or all is lost for man.
In that tremendous silence lone and lost
Of a deciding hour in the world's fate,
In her soul's climbing beyond mortal time
When she stands sole with Death or sole with God
Apart upon a silent desperate brink,
Alone with her self and death and destiny
As on some verge between Time and Timelessness
When being must end or life rebuild its base,
Alone she must conquer or alone must fall.
No human aid can reach her in that hour,
No armoured God stand shining at her side.
Cry not to heaven, for she alone can save.
For this the silent Force came missioned down ;
In her the conscious Will took human shape,
She only can save herself and save the world."

Savitri Book VI Canto 2

উদ্ধৃতাংশটি পড়িয়া মনে হইল যেন ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৈববাণী। সাবিত্রীর জীবনের সঙ্কটই যেন আজ ভারতের সঙ্কটের মধ্যে রূপ লইয়াছে এবং এই মহা-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—তপস্যালব্ধ যে অপ্রাকৃত বা অতি-প্রাকৃত শক্তিতে সাবিত্রী আপনাকে সঙ্কটমুক্ত করিয়াছিল সে শক্তি বর্ত্তমান ভারতের আছে কিনা? শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় অবস্থানের সময়ে 'সাবিত্রী' রচিত। ঋষির দৃষ্টি যে দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে উদ্ধৃতাংশের মধ্যে তাহারই পরিচয় সুস্পষ্ট।

সাথীর সন্ধান

ইহার পর আশ্রমের বিভিন্ন কর্মবিভাগ পরিদর্শন, সম্মেলনের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা, সমুদ্রকূলবর্তী ভোজনশালায় ভোজন। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের ন্যায় এই ভোজনশালাটি সমুদ্রকূল হইতে গাঁথিয়া তোলা। আহার করিতেছি—সম্মুখে সমুদ্রতরঙ্গ ভোজনগৃহের ভিত্তিমূলে আসিয়া পড়িতেছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সম্মেলনে যোগদান। আমার দিক হইতে সর্বক্ষণ চলিয়াছে পথের সন্ধান ও সাথীর সন্ধান কিন্তু কোনোটিতেই বিশেষ কোনা সুবিধা মিলিল না। সম্মেলনে গৌরীপুর-রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি নাকি কাল দক্ষিণে চলিয়া যাইতেছেন? আপনার কি পূর্ব হইতে কোনো বন্দোবস্ত করা আছে?"

বলিলাম—"না; যাইব, ইহাই জানি; পথ জানি না। সঙ্গী এখন পর্যন্ত পাই নাই। বন্দোবস্তও কিছু নাই।"

তিনি বলিলেন—"তবে কিসের ভরসায় আপনি একা একা এই ভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছেন ?"

বলিলাম—"ভরসা একটা আছে—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' বলিয়া গীতায় একটা কথা আছে। কথাটা যে সত্য আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে উহা পরীক্ষিত সত্য। এই কয়টি কথার উপরে ভরসা করিয়াই বাহির হইব। একটি স্যুটকেস আমার সম্বল। তাহা লইয়া সন্নিকটস্থ রেলষ্টেশনে গিয়া গন্তব্যস্থানের জন্য টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিব। তাহার পর যাহা ঘটে। আমার জীবনে ঘটনা এইভাবেই ঘটিয়াছে।"

ক্ষিতীশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। সম্মেলনের কাজ মিটিলে প্যারেড গ্রাউণ্ডে উপস্থিত হইলাম। কাল প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই নাই। আজ না হইলে আর দেখা হইবে না। তাহা ছাড়া শ্রীমায়ের আগমনবার্ষিক উপলক্ষে আজ বিশেষ প্যারেড। প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠান এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। মানুষকে নূতনভাবে গড়িবার জন্য পণ্ডিচেরী আশ্রম কি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেণ্ট করিতেছেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠানে তাহার পরিচয়। মনে হইল, সমাজে ও ধর্মে পূর্বগুরুগণ নূতন জীবন গঠন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সকল একস্‌পেরিমেণ্ট করিয়া গিয়াছেন, পণ্ডিচেরীর একস্‌পেরিমেণ্ট তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক। কিন্তু সকল কথা বলিবার স্থান এখানে নাই। প্যারেড দর্শনের পর সাধারণ ভোজনশালা হইয়া শ্রীদিলীপ রায়ের গৃহে আগামীকল্যকার

সম্মেলনের কার্যসূচীর আলোচনা ও প্রস্তাব-রচনার পর গোলকুণ্ডা ভবনে গিয়া বিশ্রাম লইলাম।

যাত্রার উদ্যোগ

বুধবার সকাল হইতে মন কি রকম আনচান করিতে লাগিল—আজ যাইতে হইবে। যাহাদের সহিত একসাথে আসিয়াছিলাম তাহারা দিব্য আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিশ্চিত পথে চলিয়া যাইবে। আমাকে যাত্রা করিতে হইবে একা অচেনা পথে। অথচ যাইব না বলিয়া মনকে নিবৃত্ত করিতেও পারিতেছিলাম না। কারণ, জানিতাম, এ সুযোগ আর নাও আসিতে পারে। এই যাত্রায় দক্ষিণের শেষ কন্যাকুমারী পর্যন্ত দেখিয়া যাইতেই হইবে। মনে যাহা চলিতেছিল বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না; শান্তভাবেই সঙ্গীদের জানাইয়া দিলাম, তাঁহাদের ছাড়িয়া আমার পথে আমি যাত্রা করিব। পণ্ডিচেরীর সমুদ্রে স্নান করিয়া লইবার ইচ্ছা ছিল—চারুবাবুর সহিত যাইয়া প্রাতঃকালীন স্নান তথায় সমাধা করিয়া আসিলাম। পণ্ডিচেরীর সমুদ্র প্রায় পুরীর সমুদ্রের মতো। চোরাটান (under-current) আছে, সেজন্য ঘাটে পাহারা থাকে, সাবধানে নামিতে হয়। পাহারাদার সতর্ক করিয়া দিল, সেদিন চোরাটান বেশী। দেখিলামও বটে, ঘাটে স্নানার্থী অপর কেহ নাই। স্নান সারিয়া গোলকুণ্ডায়, তথা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে। আজ প্রস্তাব গ্রহণ এবং সম্মেলনের পরিসমাপ্তি। সম্মেলন শেষ হইবার পর শ্রীদিলীপ রায়ের গৃহে প্রীতি সম্মেলন। প্রীতি সম্মেলনের উপহার লাভ দিলীপবাবুর গান এবং আমাদের অনুরোধে শ্রীসাহানা দেবীর

গান। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবুর সহিত যাহা আলাপ হইল তাহাতে আলোচনার কথা আছে। কিন্তু তাহা এখন তুলিব না। মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা আজও সমুদ্রকূলের ভোজন-শালায়। তথায় আমার আজ দক্ষিণে চলিয়া যাওয়ার কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিলেন—পণ্ডিচেরীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেন শ্রীযুত আয়েঙ্গার। তাঁহার বাস ত্রিচিনপল্লী। তিনি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসিয়াছেন। মোটরে ফিরিবেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলে তিনি একেবারে মোটরে ত্রিচী পর্যন্ত লইয়া যাইবেন। শুনিয়া মনে হইল হাতে চাঁদ পাইলাম। খাওয়ার সময়ে আমার খাওয়া লক্ষ্য করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বলিলেন—

তুমি আজ বেশী খাইতেছ মনে হইতেছে।

বলিলাম—কথাটা হয়তো ঠিক, কারণ ইহার পর কি জুটিবে জানি না। আজ সন্ধ্যায় তো নয়ই, কাল দুপুরেও সন্দেহস্থল।

শ্যামাপ্রসাদ—কাল কি করিবে?

বলিলাম—কিছু যদি না জুটাইতে পারি পৈতাটি বাহির করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরের চত্বরে বসিয়া থাকিব। তাহাতে যা জোটে।

শ্যামাপ্রসাদ—তাহা যদি করিতে পারো তবে নিশ্চিত জুটিয়া যাইবে।

একলা চলরে

আহারের পর আয়েঙ্গারের সন্ধান লইবার জন্য এবং তাঁহার সহিত আমার যাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চারুবাবুকে বলা

হইল। আমরা গোলকুণ্ডায় গেলাম। চারুবাবু তথায় সংবাদ দিবেন। উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় থাকিবার পর ৩টার সময়ে চারুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন আয়েঙ্গার গতকল্য চলিয়া গিয়াছেন। মনটা দমিয়া গেল, কিন্তু বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্রতা বাড়িল। একা চলিতে হইবে ইহাই যখন ভাগ্য-দেবতার অভিপ্রায় তখন বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? পণ্ডিচেরীর কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজই বৈকালে শ্যামাপ্রসাদ সদলে মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়া যাইবে। আমার আর বিলম্ব করা নিরর্থক; বরং রাত্রির মধ্যে যদি পথটা অতিক্রম করিতে পারি দিনটা শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে কাটাইতে পারিব। যত শীঘ্র সম্ভব ভ্রমণ সারিতে হইলে ইহাই উপায়। ভ্রমণের এই পদ্ধতি আকস্মিকভাবে স্থির হইয়াছিল বটে। কিন্তু পরে ইহাই রীতি করিয়া লইয়াছিলাম। ব্যবস্থা এমনভাবে করিয়া লইতাম যাহাতে রাত্রিটা গাড়ীতে কাটানো যায়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই, রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। গাড়ীতেই প্রাতঃশৌচাদি সারিয়া একেবারে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া নামিতাম এবং নামিয়াই ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে বা সন্ধান বিভাগে যাইয়া জিজ্ঞাসাপত্র করিয়া পরবর্তী গন্তব্য স্থানে রওয়ানা হইবার গাড়ী এমনভাবে ঠিক করিয়া লইতাম যাহাতে দিনটা ভ্রমণে ও দর্শনে কাটাইয়া রাত্রিতে আসিয়া গাড়ীতে আশ্রয় লইতে এবং রাত্রিশেষে পরবর্তী স্থানে পৌঁছিতে পারি।

কাদ্দালুর

মাদ্রাজ হইতে বন্ধুটি বলিয়া দিয়াছিলেন পণ্ডিচেরী হইতে ট্রেণ না ধরিয়া মোটরে সোজা কাদ্দালুর যাইতে। কারণ ট্রেণ ধরিলে পণ্ডিচেরী হইতে ভেলুপুরম্ ঘুরিয়া কাদ্দালুর দিয়াই ত্রিচিনপল্লী যাইতে হইবে। সোজা কাদ্দালুরে গিয়া গাড়ী ধরিলে সময়সংক্ষেপ হইবে। চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাদ্দালুরে যাইবার উপায় 'মোটর বাস', উহা বৈকাল ৪টায় পণ্ডিচেরী হইতে ছাড়ে। আমি প্রস্তুত হইলাম। তিনি একজন আশ্রমকর্মীকে সঙ্গে দিলেন। কর্মীটি একখানি সাইকেল-রিক্সা করিয়া আমাকে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। দশ আনার টিকিট কাটিয়া 'বাসে' উঠিয়া বসিলাম। যাত্রা সুরু হইল।

কাদ্দালুরে 'বাসে' উঠিতে গিয়া প্রথম অসুবিধা উপলব্ধি করিলাম ভাষা। কণ্ডাক্টার কিছু বলিল, যাহাতে মনে হইল, আমার স্যুটকেসটার জন্য পৃথক ভাড়া চাহিতেছে। ইঙ্গিতে আপত্তি জানাইলাম। আশ্রমকর্মীটি যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিলাম। সে কণ্ডাক্টারকে বলিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিল, অবশ্য তামিল ভাষায়। পূর্বেই বলিয়াছি অন্য কোন ভাষা এদেশে অচল। হিন্দী চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মহলে চলে, কিন্তু সাধারণে ও পথে তাহা অচল। দেবালয়ে সংস্কৃত চালাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি ; এক মাদুরা মন্দিরে ছাড়া অন্য কোথাও সে ভাষাতে কোন সাড়া পাই নাই। তামিল-রাজ্য মাদ্রাজের উপপ্রদেশ মাত্র। কিন্তু

তামিলীরা আপনাদের ভাষাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে কোন প্রাদেশিক ভাষা সেরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে কি না সন্দেহ। 'বাসের' টিকিটে ও 'বাসের' গায়ে মূল্যের ও গন্তব্যস্থানের পরিচয়ে তামিল ভাষা ও তামিল অক্ষর ব্যবহৃত। বোর্ড দেখিয়া অপরের বুঝিবার উপায় নাই, কোন্ 'বাস' কোথায় যাইবে। একমাত্র চিহ্ন যাহা বোঝা যায়, একটা নম্বর, নম্বরটা ইংরেজীতে ; উহা বাসরুটের পরিচয়। আমি এই নম্বর অনুযায়ী রুট-পরিচয় জানিয়া লইতাম এবং তাহাতেই কাজ চালাইতাম। কাদ্দালুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া পরবর্তী ট্রেণের সময় জানিতে গিয়া দেখিলাম টাইম-টেবলটি আগাগোড়া তামিল ভাষায় মুদ্রিত। রেলগাড়ীর প্রথম প্রবর্তন বাঙলা দেশে, বাঙলায় টাইম-টেবল মুদ্রিত হয় শুনিয়াছি কিন্তু এ পর্যন্ত ষ্টেশনে পুরাপুরি বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত টাইম-টেবলের ব্যবহার চোখে পড়ে নাই। অথচ কাদ্দালুর ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম, ইহাই একমাত্র টাইম-টেবল। শিক্ষিত তামিলীরা মুখে ইংরেজীতে খুব দড়, কিন্তু আমাদের এখানে ইংরেজী ভাষা যেরূপ প্রধান হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তামিল অঞ্চলে তাহার প্রমাণ পাই নাই।

পথের দেখা

'বাস' ছাড়িল। তখন উপলব্ধি করিলাম আমি একা। যাহাদের ভাষা পর্যন্ত বুঝি না, তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই থাকিতে হইবে। কাহাকেও না কাহাকেও আপন করিয়া না লইলে ইহা সম্ভব নহে। 'বাসের'

আরোহীদিগের সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া একজনের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম ; ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাস' কাদ্দালুরে পৌঁছিবে কখন? তিনি বলিলেন, সন্ধ্যায়। কাদ্দালুর হইতে ত্রিচীতে নামিয়া কাবেরীস্নানে ও রঙ্গনাথদর্শনে যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ত্রিচীতে যাইবেন কেন? ত্রিচী তো রঙ্গনাথ ছাড়াইয়া। তাহা না করিয়া শ্রীরঙ্গম স্টেশনে নামাই আপনার ঠিক হইবে। সেখানেই কাবেরী ও রঙ্গনাথের মন্দির। শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিতে ভোর হইবে, সেখান হইতে একটা গরুর গাড়ী লইয়া কাবেরীতে যাইবেন। সকাল সকাল স্নান সারিয়া সেই গাড়ীতেই মন্দিরে আসিবেন, রঙ্গনাথ দেখিয়া মন্দিরের সামনে খাবারের দোকানে কিছু খাইয়া লইবেন। সেখানেই 'বাস' দাঁড়ায়। 'বাসে' উঠিয়া জম্বুকেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইবেন। তথা হইতে ফিরিতে মধ্যাহ্ন হইবে। এই দুইটি দেখিবার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন, পাহাড়ের উপর স্বর্ণমন্দির আছে, তাহাও দেখিয়া লইতে পারেন। তাহার পর স্টেশনে ফিরিয়া আসিবেন। ইচ্ছা হইলে ত্রিচী যাইতে পারেন, কিন্তু যাইবার দরকার নাই।' পথের আরও একটি সন্ধান তাঁহার নিকট হইতে পাইলাম—শ্রীরঙ্গম যাইতে বৃদ্ধাচলম জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া লইলে পথের অনেকটা সংক্ষেপ হয়।

যাঁহার সহিত এইভাবে পরিচয় হইল, তিনিও কাদ্দালুরের যাত্রী। যথেষ্ট আগ্রহের সহিত তিনি আলাপ করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত আপনার জনের মত সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

সম্ভবতঃ, এই দূরদেশে বাঙালী-পরিচ্ছদ-পরিহিত মূর্তি তাঁহার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। আলাপে জানিলাম, ভদ্রলোক বি-এ, বি-টি, নাম পঞ্চাপগেশন, পণ্ডিচেরীর এক কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। তিনিও আমার পরিচয় লইলেন এবং পণ্ডিচেরীতে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলাম শুনিয়া পণ্ডিচেরীর কথা তুলিলেন। পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, স্থানীয় লোকের ধারণাও ইহাই। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিলেন, উহার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে স্থানীয় লোকেরা এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের সন্তানেরা উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। উহার শিক্ষা যেন কেবল ধনীর লভ্য না হয়। এই দিকটাতে লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। আলাপের প্রসঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা উঠিল। টেনিসনের "Passing of Arthur" নামক কবিতাটী তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তাহা মনে লাগিয়াছিল। তিনি বুঝাইলেন এবং আমারও মনে হইয়াছিল, তাঁহার কথা ঠিক, যে, উহাতে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—ত্রয়ের সম্মিলন ঘটিয়াছে। তিন দিক দিয়াই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। স্বীকার করিলাম, তাঁহার এ ব্যাখ্যা অভিনব।

দক্ষিণের প্রকৃতি

তাঁহার সহিত যতক্ষণ আলাপ করিতেছিলাম, ততক্ষণ গাড়ী হু-হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর আমি বসিয়া বসিয়া দক্ষিণের

গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা দেখিতেছি। বিস্তৃত প্রান্তর—ঘন নারিকেলের বনের সারি—মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও বালুকাময়, বিশাল, শুষ্ক নদীর খাত। দণ্ডকারণ্য-বর্ণনচ্ছলে দক্ষিণের প্রাকৃতিক শোভার যে বর্ণনা ভবভূতি 'উত্তরচরিতে' দিয়াছেন, বসিয়া বসিয়া তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলাম :—

"স্নিগ্ধশ্যামা ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষা
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাং
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥"

'কোথাও বনরাজীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—কোথাও বিস্তৃত প্রান্তরের ভীষণ রুক্ষতা—স্থানে স্থানে নির্ঝরের পতন-শব্দে ধ্বনিত দিঙ্মণ্ডল ; পুণ্য জলাশয়, আশ্রম, পর্বত, নদী, গহ্বর ও অরণ্যের সংমিশ্রণে প্রকৃতির বিচিত্র রচনা এই ভূভাগ।'

ভবভূতি দক্ষিণাপথের কবি।

একে একে চারিটি নদীর সেতু পার হইতে হইল—দুইটি নদীর নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, দুইটির নাম জানিতে পারিয়াছিলাম—পেন্নার ও গরুড়। সমুদ্রের যে অত্যন্ত নিকট দিয়া যাইতেছি, তাহা নদীর সেতু পার হইবার সময়ে বুঝিতে পারিতেছিলাম। বনরাজীনীলা সমুদ্রবেলার তরুপ্রাচীর বিভক্ত করিয়া নদী সমুদ্রে মিশিয়াছে এবং সেই মুক্ত পথে সমুদ্র-তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্ভবতঃ, পেন্নার নদীর মোহানা দিয়াই সমুদ্র-দর্শনের চমৎকার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ইহারই মধ্যে পূর্বের ন্যায় দুইবার শুল্ক-সীমানা পার হইতে হইল। পণ্ডিচেরীতে আসিবার সময়ে মোটরে ছিলাম, আমাকে শুল্ক-অফিসে যাইতেও হয় নাই, শুল্ক-বিভাগীয় পরীক্ষার রকমটা বুঝিতে পারি নাই। এবার তাহা বুঝিলাম। যাত্রিবাহী 'বাস' শুল্ক-সীমায় পৌঁছিবামাত্র আরোহীদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। তারপর খালি 'বাসটি' শুল্ক-সীমানা পার হইয়া পার্শ্ববর্তী মাঠে অপেক্ষা করে। একজন কর্মচারী 'বাসটির' ভিতরে বাহিরে, তলায় ও উপরে সমস্ত দেখিয়া লন। আর যাত্রীরা শুল্ক-অফিস-গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি সরু পথের মধ্য দিয়া একে একে মালপত্র লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া পুনরায় 'বাসে' ওঠে। অফিস-গৃহের মধ্যে ব্যবস্থাটা অনেকটা ব্যাঙ্কের কাউণ্টারের মত। তাহার এক পাশ দিয়া যাত্রীরা যায় এবং অপর পাশে দাঁড়াইয়া শুল্ক-কর্মচারীরা মালপত্র পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেন। এই পরীক্ষা লইয়া আমাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। স্যুটকেসের উপরে নাম লেখা ছিল। কলিকাতা হইতে আসিতেছি শুনিয়া নিয়ম রক্ষার জন্য বাক্সটি খুলিয়া মোটামুটি দেখিয়া তাঁহারা আমাকে অব্যাহতি দেন।

কাদ্দালুর—সন্ধ্যা

চলিতে চলিতে 'বাস' কাদ্দালুরে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা। বাহিরে অন্ধকার নামিতেছে—মনের মধ্যেও অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে। বুঝিতেছি, এইবার সত্যই একা হইতে

হইবে। পঞ্চাপগেশন চলিয়া যাইবেন। তারপর যদি সময়মতো গাড়ী না পাই, রাত্রিতে কোথায় থাকিব জানি না। মনের অবস্থা হয়তো মুখের ভাবে খানিকটা ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে। অধ্যাপক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি ইচ্ছা করিলে রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে থাকিয়া যাইতে পারেন, কাল সকালে না-হয় যাইবেন। তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তখন পথের আকর্ষণের বেগে চলিয়াছি, কোথায়ও থাকিয়া যাইবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

'বাস' হইতে নামিয়া তিনি একটি কুলী ডাকিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া কাদ্দালুর স্টেশনে আসিলেন। আমার জন্য নিজে গিয়া টিকিট কিনিলেন এবং আমার যাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে, তজ্জন্য স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করিলেন। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট পাওয়া গেল না। এই সকল স্থানীয় গাড়ীতে থাকে শুধু তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণী; মধ্যম শ্রেণীর টিকিট লইয়া বৃদ্ধাচলমে গিয়া বদলাইয়া লইতে বলিলেন। অধ্যাপকের ইচ্ছা ছিল আমাকে একেবারে বৃদ্ধাচলম পৌঁছাইবার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন, তাহা হইল না। পূর্বে কাদ্দালুর হইতেই গাড়ী ছাড়িয়া বৃদ্ধাচলম যাইত। নূতন ব্যবস্থায় তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এখন এখান হইতে গাড়ী ছাড়ে না। মায়াভরম হইতে আসিয়া গাড়ী কাদ্দালুর দিয়া ভেলুপুরম যায়, ফিরিবার সময়ে বৃদ্ধাচলমের যাত্রী লইয়া কাদ্দালুরের পরবর্তী স্টেশনে নামাইয়া দিয়া যায়। সেখানে অন্য গাড়ী ধরিয়া বৃদ্ধাচলম যাইতে হয়। বৃদ্ধাচলমে রাত্রি

বারোটার পর মাদ্রাজ হইতে আগত গাড়ী ধরিয়া শ্রীরঙ্গম যাইতে হইবে। আমরা যখন কাদ্দালুর পৌঁছিয়াছি, তখনও মায়াভরমের গাড়ী আসে নাই। আমরা পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই উহা আসিয়া ভেলুপুরমের দিকে চলিয়া গেল। আমাকে তুলিয়া দেওয়ার জন্য গাড়ী পুনরায় ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা পঞ্চাপগেশনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি একটি ছোকরা কুলীকে ডাকিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন, আমাকে উঠাইয়া দিতে বলিলেন এবং গাড়ী ভেলুপুরম হইতে ফিরিয়া স্টেশনের যেখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেই জায়গায় আমাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। বিদায় দিতে ক্লেশ হইল।

অন্ধকার ঘনীভূত

পঞ্চাপগেশন চলিয়া যাইবার পর নিজের অবস্থা আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিলাম—সম্পূর্ণ একাকী, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। অনিশ্চয়তার গুরুভারে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ-ভ্রমণ আমাকে অনেক করিতে হইয়াছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পড়িয়া অসহায় ও একাকী ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে। কিন্তু উহা কখনও এমন অসহনীয় বোধ হয় নাই। আপনার নিয়তির উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল মন কখনও বিচলিত হয় নাই। এবারকার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ আকস্মিক। একাকিত্বের চিন্তাই মনকে পীড়িত করিতেছিল। অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ একটা ঘটনাচক্র। তথাপি মনে হইতেছিল, তিনি

যেন কত আপনার! তাঁহার সহিত অন্ততঃ ভাব-বিনিময়ের উপায় ছিল। কিন্তু এখন আমি যেন সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। গৃহে অশীতিপর বৃদ্ধা জননী, নিতান্ত অসুস্থ। সেইজন্য বাহিরে যাইতে হইলে,—গৃহের সহিত দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদান করা যায় এবং দ্রুত ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে,—ইহা লক্ষ্য রাখিয়া যাতায়াত করি। কিন্তু এখন? দ্রুত ফিরিয়া য়াওয়া দূরে থাকুক, সংবাদ পাইবার পর্যন্ত কোন উপায় নাই; কারণ আমার নিজের অবস্থানই অনিশ্চিত। দীর্ঘকাল এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি নাই। মনে হইল, এরূপ অবস্থায় হঠকারীর মত চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। একবার ভাবিলাম, এখান হইতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু ফিরিতে হইলেও ফিরতি-গাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত থাকিতে হইবে। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত ষ্টেশনে রাত্রিযাপনের স্থান কোথায়? ষ্টেশন-অফিসের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—দেবদর্শন ও তীর্থস্নান সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইবার কথা ভাবিতে নাই। ইহাও বুঝিতেছিলাম, এতদূর আসিয়া ফিরিয়া গেলে এ সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। অনিশ্চয়তার, সংশয়ের ও উদ্বেগের ভার অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। সে এক অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত মানসিক সঙ্কট। চতুর্দিককার নির্জনতাকে ঘিরিয়া অন্ধকার নামিয়াছে—প্রান্তরসীমায় দেখাইতেছে বনভূমির মত এবং অন্ধকারের মধ্য হইতে আসিতেছে পশুপক্ষীর শব্দ। আকাশ নির্মল, চন্দ্র নাই, কিন্তু নক্ষত্রের আলোকে খচিত।

মন স্থির করিবার জন্য অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে দেবতাকে দেখিতে চলিয়াছি, তাঁহার চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। শ্রীরঙ্গনাথের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যামুনাচার্য-স্তোত্রের কয়েক ছত্র মনে পড়িল—

"নিমজ্জতোঽনন্ত-ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধ-
স্ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ।"

অনন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছিলাম, তোমাকে পাইয়া যেন কূল পাইলাম; ইহা সত্য। কিন্তু দেবতা, ইহাও সত্য তুমি আজ দয়া প্রদর্শনের যে পাত্র পাইয়াছ এমন উপযুক্ত পাত্র আর পাইবে না।

আলোক প্রকাশ

যামুনাচার্য-স্তোত্র স্মরণে আসিতেই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হইল মহাপ্রভুর কথা। যেন চক্ষের উপরে দেখিতে পাইলাম, বাহ্য-জ্ঞানহীন সন্ন্যাসী দক্ষিণের পথে একা ছুটিয়া চলিয়াছেন। নিজের দুর্বলতায় লজ্জা অনুভব করিলাম। ভাবিলাম, বিংশ শতাব্দীর এত আয়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি আপনাকে অসহায় বোধ করিতেছি। প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল পূর্বে মহাপ্রভু যখন একা এই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ভরসা কি ছিল? সহায়সম্বলই বা কি ছিল? মহাপ্রভুর চিন্তা কিছুকাল মনকে অধিকার করিয়া রাখিবার পর সহসা যেন

অন্ধকারের মধ্যে আলোকচ্ছটার প্রকাশ অনুভব করিলাম; সহসা মনে হইল, মহাপ্রভুর একটা বড় সহায় ছিল। সে সহায় কয়েক ছত্র পদ—যাহা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্"

অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়াইয়া আবিষ্টের মত শেষ দুই ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

ট্রেণটা আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। তাহাও এক উৎকণ্ঠার হেতু। ভাবিতেছিলাম, হয়তো গাড়ী ভুল করিয়াছি। কাদ্দালুর ষ্টেশনের লাইনের অপর পার্শ্বে অন্য একটি ষ্টেশনের নাম লেখা দেখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, হয়তো ভিন্ন লাইনের কোন গাড়ী এখান দিয়া গিয়াছে। ভাবিতেছিলাম, সেই ভেলুপুরমের গাড়ীই যখন আমাকে ধরিতে হইল, তখন ছুটাছুটি করিয়া এখানে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে খোঁজ লইয়া ভেলুপুরম হইতে এই গাড়ী ধরিবার ব্যবস্থা করিলেই ভালো হইত; আরও ভালো হইত ভেলুপুরম হইতে একেবারে ইহার পরবর্তী মাদ্রাজের গাড়ী ধরা। তাহা হইলে দফায় দফায় এত গাড়ী

বদল না করিয়া এবং এই অনিশ্চিতের মধ্যে না আসিয়া একেবারে শ্রীরঙ্গমে গিয়া নামিতে পারিতাম। কিন্তু সেকথা তখন আর ভাবিয়া লাভ নাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইতেছিল, ট্রেণে আসিলে পথে যাহা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহা দেখা ঘটিত না—যে ব্যক্তিগত পরিচয় হইয়াছে (এবং পরে আরও যে পরিচয় হইল) সে পরিচয়ের সুযোগও মিলিত না। ট্রেণের বিলম্বের কারণ এবং ঠিক ট্রেণের জন্য দাঁড়াইয়া আছি কি না জানিবার জন্য উদ্বেগ হইতেছিল। ষ্টেশন-অফিস পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাপগেশন যে ছোকরা কুলীটিকে জুটাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে কোনমতে বুঝাইতে পারিতেছিলাম না—বুঝিলেও সে আমার উত্তর দিতে পারিতেছিল না। আর একটি কুলী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সহিত কেবল হাসাহাসি করিতেছিল। উভয় দিক হইতে পরস্পরকে বুঝাইবার অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ছোকরা কুলীটি যথেষ্ট চেষ্টায় দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'হাফ আওয়ার'। বুঝিলাম, ট্রেণ অন্তত আধ ঘণ্টা লেট। ছোকরাটি এতক্ষণে বুঝিল যে, আমি বুঝিয়াছি এবং আমাকে যে বুঝাইতে পারিয়াছে, সেই আনন্দেই উভয় সঙ্গী মিলিয়া হাসিতে হাসিতে প্লাটফর্মের উপর গড়াগড়ি।

এতক্ষণ আমি মহাপ্রভুর নামমন্ত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছি। আবৃত্তি করিতে করিতে মনের দ্রুত অবস্থান্তর উপলব্ধি করিলাম। রসায়ন সেবনে দুর্বল দেহে যেমন বল ফিরিয়া আসে, তেমনি নামমালা আবৃত্তি করিতে করিতে মন শান্ত ও সুস্থ হইয়া আসিল। সংশয়ব্যাকুল মন আবার আত্ম-

বিশ্বাসে স্থির হইল। সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ় হইল। সংশয়, উদ্বেগ, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ঘুচিয়া আশ্বাস জাগিল। নৈশ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে সঙ্কটের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহা কাটিয়া গেল। স্থির করিলাম, যতক্ষণ পথ চলিব, মহাপ্রভুর অবলম্বিত এই নামমালা আবৃত্তি করিতে থাকিব।

ভাবিতে ভাবিতে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। এতক্ষণের সঙ্গী ছোকরা কুলীটি আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইল। গাড়ীতে লেখা আছে সেকেণ্ড ক্লাস, অথচ ইণ্টার ক্লাস টিকিট লইয়া উঠিতে হইতেছে, একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানকার এই ব্যবস্থা, বিশেষতঃ আমাকে যাইতে হইবে মাত্র একটা ষ্টেশন পর্যন্ত। পরবর্তী ষ্টেশনে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না, নামিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া বৃদ্ধাচলমের গাড়ীতে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানেও সেই ব্যবস্থা। ইণ্টারের টিকিটে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ। বৃদ্ধাচলম পৌঁছিতে কিছু সময় লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া একটু ভাবিবার সময় পাইলাম। ভাবিতেছিলাম, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কয়েকশত যুবক যে দক্ষিণের রেলপথে কাজ লইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত দেখা হয় না! দেখিতে দেখিতে যাই, কেহ না কেহ চোখে পড়িবেই। কোন স্টেশনে গাড়ী থামিলেই আলোকমিশ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব মনোযোগের সহিত লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—বাঙালী মুখের ছাপ দেখা যায় কিনা। অনুমান করিয়া দুই-একজনের সঙ্গে আলাপও করিলাম। কাজে আসিল না। গাড়ী বৃদ্ধাচলম ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

বৃদ্ধাচলম—কূল মিলিল

বৃদ্ধাচলম একটি বৃহৎ জংসন স্টেশন। দক্ষিণ ভারতের সব কয়টি প্রধান রেলপথ এই জংসনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নামিয়াই দেখিয়া লইলাম ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর কোথায়। স্যুটকেসটি হাতে লইয়া সোজাসুজি লাইনের উপর দিয়া অপর দিকের প্ল্যাটফরমে উঠিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ঘরে নাই, ডেপুটি আছেন, যুবক। স্যুটকেসটি নামাইয়া বলিলাম, কলিকাতা হইতে আসিতেছি, ত্রিচিনপল্লীর লাইনে যাইব ; তিন দফা সাহায্য চাই—প্রথম, ইণ্টার ক্লাস টিকিটটি বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিতে হইবে ; দ্বিতীয়, গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং তৃতীয়, আমার গন্তব্য ও দর্শনীয় স্থানগুলি যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে এবং সুবিধায় ভ্রমণ করা যায়, তাহার একটি প্ল্যান করিয়া দিতে হইবে। সাড়ে নয়টায় বৃদ্ধাচলম পেঁৗছিয়াছি—সাড়ে বারটার পর মাদ্রাজ হইতে গাড়ী আসিয়া পেঁৗছিবে শুনিয়াছি। এই সময়টার মধ্যে ভ্রমণের প্ল্যানটা করিয়া লইতে চাই। সহসা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া যুবকটি খানিকটা বিব্রত হইয়াই আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আমারও ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। উত্তরটা কি আসিবে, ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিয়া উঠিল—"স্যার, আপনি কি বাঙালী !" অকস্মাৎ দেবতা স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হইলেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হইতাম না। বিদ্যুৎগতিতে ফিরিয়া দেখিলাম, দুইটি প্রিয়দর্শন বাঙালী যুবক রেলকর্মীর পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যামুনাচার্য-স্তোত্র মনে পড়িল—

'নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ'। পাথারের মধ্যে সহসা কূল মিলিল।

সন্ধ্যায় কান্দালুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া মনের অবস্থাটা যাহা হইয়াছিল, এখনকার অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দীর্ঘ সময়ের নৈরাশ্যবোধ, অনিশ্চয়তা ও আকুল সন্ধানের পর সহসা বৃদ্ধাচলমে আসিয়া পরিচিত বাঙালী সম্বোধন শুনিয়া মনটা অননুভূতপূর্ব আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। গ্লানি ও অবসন্নতা কাটিয়া গেল। সংশয়-দুর্বল মনে ভরসা ও স্বস্তিবোধ ফিরিয়া আসিল। যুবকদ্বয়ের প্রতি গভীরতম প্রীতি অনুভব করিলাম। ডেপুটি ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়কে বলিলাম—'আমার উপায় মিলিয়াছে, আপনাকে আর বিব্রত করিব না। আপনার এই যুবক সহকর্মিদ্বয়কে কিছুকাল আমার জন্য ছাড়িয়া দিন, তাহাতেই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে'। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন, আমিও সানন্দে যুবকদ্বয়ের সহিত বাহির হইয়া আসিলাম।

এই যুবকদ্বয়ের সহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ আমার ভ্রমণের এক বিশেষ ঘটনা। পরবর্তী ভ্রমণ-তালিকা যে অভিপ্রায়ানুরূপ সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার জন্য এই যুবকদ্বয়ের নিকট আমি ঋণী। রেলওয়ের কার্য উপলক্ষে ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণের প্রায় সর্বস্থান ইহাদের জানা। ডেপুটি স্টেশন মাষ্টার মহাশয়কে যে প্ল্যানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম সে প্ল্যান ইহারাই তৈয়ারী করিয়া দিল। কোথায় কোন লাইনে যাইতে হইবে, তাহার পর কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় কি কি

বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং কোথায় কিভাবে আশ্রয় পাওয়া যাইবে সমস্তটা ইহারা আমাকে মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়াছিল। তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া চলাফেরা করিয়াছি।

ভুলিবার নহে

যুবকদ্বয় আমাকে সঙ্গে লইয়া ওয়েটিং রুমে আসিল, আমি বলিলাম "সমস্ত পথটা তোমাদেরই খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়াছি।" অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে তাহাদের দেখিয়া আমার যেমন আনন্দ হইয়াছিল, বাঙলা হইতে আগত একজন বাঙালীকে পাইয়া তাহাদেরও তেমনি আনন্দের সীমা ছিল না। স্টেশনেই তাহারা আমার মুখ হাত ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং রাত্রের আহার্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে চাহিল। নিবৃত্ত করিয়া আমি তাহাদিগকে আমার কাছেই থাকিতে বলিলাম। তাহারা আমার পরিচয় লইল। আমি তাহাদের পরিচয় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার সন্ধান লইলাম। যুবকদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ ফণীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী বোয়ালমারী, ফরিদপুর। তাহার পরিবার তখন যাদবপুর ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ট্রাষ্টের এলাকায় বাস করিতেছে। অপরটির নাম প্রণবকুমার রায় চৌধুরী, বাড়ী উলপুর, ফরিদপুর; তাহার পরিবার বাস করিতেছে বেলঘরিয়া চাঁদমারী কলোনীতে। ইহারা যাহা উপায় করে তাহা হইতে আপনাদের খরচা চালাইয়া সম্ভব হইলে পরিবারকে অর্থ সাহায্য করে। তাহাদের জীবনযাত্রার সন্ধান লইয়া জানিলাম, তাহাদের বাস স্টেশন-প্ল্যাটফরম, পরিচ্ছদ দুই প্রস্থ পোষাক, আহার সন্নিকটস্থ হোটেলে। আহারের অসুবিধা—টকের প্রাধান্য।

মাংস খাইবার সময়েও তাহার মধ্যে খানিকটা টক ঢালিয়া দেয়। মাছ নাই, তবে একটু ঘি পাওয়া যায় সেটুকু ভাল। প্রধানতঃ জীবনযাত্রার এই অসুবিধার জন্য অনেকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের বুঝাইয়া বলিলাম এই অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়ার অর্থ পরাজয় স্বীকার করা। পরাজয় স্বীকার করা উচিত নহে। কষ্ট বা অসুবিধা যতই হউক তাহাদিগকে সহিয়া থাকিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত তাহাতে ভালই হইবে। সে কথা তাহারা স্বীকার করিল। তাহারা যখন প্রথম এই অজানা অঞ্চলে আসিয়াছিল তখন একটা অস্পষ্ট ভয়ে ও সন্দেহে তাহাদের মন পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কয় মাস কাজ করিবার পর এখন তাহাদের আত্মবিশ্বাস আসিয়াছে, এখন তাহাদের ভরসা হইয়াছে তাহারা যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা আমার বিশ্বাস হইল। তাহারা বলিল আরও উদ্বাস্তু যুবক দক্ষিণের স্টেশনে স্টেশনে ছড়াইয়া আছে—ত্রিচিনপল্লীতে এবং মাতুরাতে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের দেখা পাইব। কয়েকটি নামও দিল—বলিলাম খোঁজ লইব।

আমার ভ্রমণের তালিকা শুনিয়া যুবকদ্বয় তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া দিল। মাদ্রাজ হইতে বন্ধুটি যে ত্রিচিনপল্লীতে নামিয়া শ্রীরঙ্গম যাইতে বলিয়াছিল তাহারা তাহাই বহাল করিল। পঞ্চাপগেশন শ্রীরঙ্গমের টিকিট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বদলাইয়া ত্রিচীর টিকিট লইতে বলিল। শ্রীরঙ্গম, গোল্ডেন রক, ত্রিচী টাউন স্টেশন এবং ত্রিচী জংসন পরপর এই

যে কোনো ষ্টেশনে নামিয়া রঙ্গনাথ দর্শনে যাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল আমি যেন ত্রিচী জংসন স্টেশনেই নামি। তাহাদের কথায় বুঝিলাম শ্রীরঙ্গমে নামিলে কোনো আশ্রয় মিলিবে না, স্যুটকেসটি কোথাও রাখিয়া যে চলাফেরা করিব তাহারও উপায় থাকিবে না। ত্রিচীতে নামিলে সবই পাওয়া যাইতে পারে। আর কিছু না মেলে স্টেশনে ঘর লইতে পারিব অথবা স্টেশন ঘরে স্যুটকেস জমা রাখিয়া শ্রীরঙ্গমের কাজ সারিয়া আসা যাইবে। ত্রিচী যাইতে শ্রীরঙ্গম ছাড়াইয়া যাইতে হয় বটে; কিন্তু ত্রিচী হইতে শ্রীরঙ্গম যাইতে বাস পাওয়া যায়; ভাড়া মাত্র ৵১০। তাহাদের কথায় সম্মত হইয়া টিকিটটি পালটাইয়া ত্রিচিনপল্লীর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট আনিতে বলিলাম। ডেপুটি স্টেশন মাষ্টার বলিলেন ভেলুপুরম হইতে গাড়ী ছাড়িবার সময়ে যদি সেকেণ্ড ক্লাস খালি পাওয়া যায়, তবেই টিকিট দিব। যুবকদ্বয়ের নিকট জানিলাম, যে গাড়ীতে আমি যাইব উহার নাম "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস", মাদ্রাজ হইতে ছাড়িয়া ভেলুপুরম দিয়াই আসে।

বৃদ্ধাচলম স্টেশনে যুবকদ্বয়ের নিকট হইতে যে সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিবার নহে। তাহারা একটা দুঃখের কথা বলিয়াছিল, শুনিয়া গভীর বেদনা পাই। দক্ষিণে তীর্থযাত্রায় যাইতে হইলে ত্রিচিনপল্লী জংসন দিয়া যাইতে হয়। বাঙালী যাত্রী দেখিলেই তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের চেষ্টা করে। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতার কোনো প্রতিদান তাহারা পায়

না। বরং সকলেই এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে—করুণার ভাব দেখায়—মনে করে বুঝি কিছু চাহিতে আসিয়াছে। তাহাদের বলিলাম যতক্ষণ আমি স্টেসনে আছি আমার সহিত থাকিবে এবং আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তারপর ছুটি পাইবে। যুবকদ্বয়ের মধ্যের একটির—প্রণবকুমারের বদলীর আদেশ হইয়াছিল। আমি থাকিতে থাকিতেই সে মাদ্রাজ চলিয়া গেল। প্রণাম করিয়া সে যখন বিদায় চাহিল তখন এই ক্ষণিক পরিচয়ের বিচ্ছেদেও বেদনা অনুভব করিলাম। গৃহের জন্য একটা চিঠি লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম। মাদ্রাজ গিয়া ছাড়িবে। গৃহে দ্রুত সংবাদ পেঁৗছাইবার এই একটি ব্যবস্থাই কয়েকদিনের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ফণীন্দ্র আমার সহিত রহিয়া গেল, দেখিলাম সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর ঘুমে তাহার চক্ষু ভারি হইয়া আসিতেছে। ফণীন্দ্রের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও উচ্চ শ্রেণীর টিকিট মিলিল না। "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস" আসিবার আগে দুইটি গাড়ী শ্রীরঙ্গমের দিকে গেল। তাহাতে ভিড় কম ছিল। কিন্তু পেঁৗছিবে অসময়ে সেইজন্য উঠিলাম না। "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস" যখন আসিল, তখন দেখি "ন স্থানং তিলধারণং"। ফণীন্দ্রের সাহায্যে একটা ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া প্রথমে দাঁড়াইবার পরে কোনোপ্রকারে বসিবার একটু জায়গা পাইলাম। বাকি রাত্রি সেইভাবেই কাটাইতে হইল। আমাকে বসাইয়া ফণীন্দ্র বিদায় লইল। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। রাত্রি ২॥টায় বৃদ্ধাচলম ছাড়িয়া চলিলাম।

(৩)

ত্রিচিনপল্লী ও কাবেরী

যাহা বলিতে এতক্ষণ সময় লাগিয়াছে তাহা বুধবার দিবা-রাত্রের, প্রধানতঃ অপরাহ্ণ হইতে রাত্রের ঘটনা। ত্রিচিনপল্লীতে যখন পৌঁছিলাম তখন বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা—পথে শ্রীরঙ্গম, 'গোল্ডেন রক' ও ত্রিচী টাউন ছাড়াইয়া সুদীর্ঘ কাবেরী-সেতু পার হইয়া আসিয়াছি। স্টেশনে নামিয়াই একটি ছোকরা মজুর জুটিয়া গেল। তাহার হাতে স্যুটকেসটি দিয়া স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকে চলিলাম। স্টেশন-মাস্টার ঘরে নাই। সন্ধান-বিভাগে সন্ধান লইলাম—লোক নাই। কিছুকাল অপেক্ষার পর সন্ধান-কর্মচারীটি আসিলেন। তাঁহাকে জানাইলাম আমি এখানকার কাজ সারিয়া আজই ধনুষ্কোটি রওয়ানা হইতে চাই—সুবিধামত গাড়ী ঠিক করিয়া দিতে হইবে এবং একটি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া দিতে হইবে। তিনি সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ দিতে তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন; রাত্রি ১০টায় ধনুষ্কোটির গাড়ী যায়, সেই গাড়ীতে যাইবার পরামর্শ দিলেন। ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বর হইয়া মাদুরা যাইতে চাই শুনিয়া বলিয়া দিলেন, রামেশ্বর হইতে রাত্রি ৩টার সময় গাড়ী ছাড়ে সেই গাড়ীই আমার পক্ষে সুবিধা হইবে। বৃদ্ধাচলমের যুবকেরা যেখানে আশ্রয় লইবার কথা বলিয়াছিল তাহা তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি ছোকরা মজুরটিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। বলিয়া রাখি মজুর ও আমার মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছিল হাতের ভঙ্গীতে ও চোখের ইঙ্গিতে।

স্টেশন হইতে বাহির হইতেই ত্রিচীর স্টেশন-গৃহটির গঠনশোভা চোখে পড়িল। গৃহটি বিশাল বা জমকালো নহে; কিন্তু এমন সুদৃশ্যভাবে গঠিত স্টেশন-গৃহ বড় দেখি নাই। আমার গন্তব্যস্থান সন্নিকটে; মজুর ও স্যুটকেস সহ গিয়া দেখিলাম তথায় স্থানাভাব। অগত্যা অন্য আশ্রয় খুঁজিতে হইল—সমস্ত রাত্রির পথক্লেশ, অনিদ্রা এবং আকস্মিক হর্ষবিষাদে দারুণ অবসন্নতা আসিয়াছিল; কিন্তু অবসন্নতাকে প্রশ্রয় দিবার মত অবস্থাও তখন নাই। ক্লান্তপদে ছোঁকরাটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। সে আমাকে একটা আশ্রয়ে আনিয়া পৌঁছাইল—তথায় একটু দাঁড়াইবার জায়গা মিলিল। আমাকে পৌঁছাইয়া সে বিদায় লইল, বলিয়া গেল রাত্রি ৯টায় আসিয়া আমাকে লইয়া ধনুষ্কোটির গাড়ীতে তুলিয়া দিবে। সমস্ত কথা ভঙ্গীতেই হইল। তাহার কাছ হইতে একটা তামিল কথা শিখিলাম—"আর" মানে ছয়। পরে আরও শিখিয়াছিলাম—"আর্‌মুখম্‌" অথবা সংক্ষেপে "আর্‌ম" কথাটির অর্থ ষণ্মুখম্‌ অর্থাৎ কার্তিক।

কাবেরীস্নান

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাবেরীস্নানে ও শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে যাইবার সন্ধান লইলাম। সন্নিকট দিয়াই 'বাস' যাইতেছে। পরিচয় তামিলে কিন্তু রুট নম্বর ইংরাজীতে। ১নং 'বাসটি' সোজা শ্রীরঙ্গমে যায় এবং মন্দিরের সম্মুখে থামে। পথে কাবেরী। ত্রিচিনপল্লী নদীর দক্ষিণে এবং শ্রীরঙ্গম কিছুদূর উত্তরে। 'বাসে' উঠিয়া বলিতে হইবে "ম্যাঙ্গো গ্রোভ" (Mango-grove)। স্থানটি কাবেরীরই উপরে; তথা হইতে তীরপথ ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইলে স্নানের ঘাট। স্নান সারিয়া পুনরায় 'বাস' ধরিয়া মন্দির। তাহাই করিলাম; স্নানের উপকরণ ও গঙ্গাজল লইয়া মন্দিরে যাইবার বেশে 'বাসে' উঠিলাম। পথে কাবেরী-সেতু পার হইবার সময়ে অপর তীরে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা গেল পুরাতন দুর্গ, দুর্গে গণেশের স্বর্ণ-মন্দির। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্থানীয় স্টেশনের নাম হইয়াছে 'গোল্ডেন রক'। কণ্ডাক্টরের নিকটে "ম্যাঙ্গো গ্রোভ" বলিতে কাবেরীর অপর পারে আমাকে নামাইয়া দিল। নদীতে স্নানের ঘাটে যাইবার পথ সম্বন্ধে স্থানীয় পুলিশ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম স্থানটির নাম "আম্মমণ্ডপম্" (আম্রমণ্ডপম)। পশ্চিমমুখে পথ স্নানের ঘাটে গিয়াছে। চলিতে চলিতে পার্শ্বেই নদী দেখা যায়। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য এক জায়গায় নামিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক সাধুবাবা সঙ্গী জুটিয়াছিলেন। তিনি নিষেধ করিলেন ইহা স্নানের ঘাট

নহে। তিনি আমার পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি বাঙালী দেখিতেছি, কোথায় কোথায় যাইবেন ?' উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি দূরদেশ হইতে একা এইভাবে আসিয়াছেন বড় আশ্চর্য্যের কথা! একা একা কেহ এভাবে চলে না'। কথা বলিতে বলিতে পথের দুই পার্শ্বের আম্রবন ও বেণুবনের ঘন সন্নিবেশের মধ্য দিয়া স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সুপ্রাচীন বিশাল ঘাট। প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে দ্বারপাল-মূর্তি এবং তোরণের ঊর্ধ্বদেশে শ্রীরঙ্গশায়ী বিষ্ণুর মূর্তি—বাঙলা দেশে আমরা যাহাকে বলি অনন্ত-শয্যায় নারায়ণ। সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর এবং তাহার পর প্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানের শ্রেণী নদীর মধ্যে নামিয়াছে। নদীর গর্ভে পীতবর্ণের বালুকা, জলও পীতবর্ণ—নদীতে স্রোত আছে, কিন্তু জল অগভীর, দাঁড়াইলে এক হাঁটু ; মজ্জন ও অবগাহনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলে প্রণামের ভঙ্গীতে অতি কষ্টে উপুড় হইতে হয়। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সহসা পায়ে কিসের দংশন অনুভব করিলাম ; বিচলিত হইয়া সরিয়া আসিতেছি দেখিয়া একজন স্নানার্থী বলিলেন—"এক প্রকার মৎস্য"। যতক্ষণ জলে রহিলাম, ক্রমাগত দংশন চলিতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে—সুস্থ হইয়া স্নানাদি করিবার অসুবিধা অনেক—পার্শ্বে এক অশ্বপাল অশ্বস্নান করাইতেছে, অশ্ববিষ্ঠায় প্রায় আমারই কাছে, ঘাটের একাংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাটের অপর পার্শ্বে এক রজক-প্রবর প্রচণ্ড ক্ষেপে কাপড় কাচিতেছে—ময়লা কাপড়ের ক্ষারজল

ছিটকাইয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছে—একটু সরিয়া কয়েকজন যুবতী স্নান করিতেছে আর ঠিক তাহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া স্নানে নামিলেন এক ব্রাহ্মণ যুবক—সুদীর্ঘ, সবল, সুঠাম ও সুগঠিত দেহ—পরিধেয় বস্ত্রখানি ঘাটে খুলিয়া রাখিলেন, আবরণ রহিল মাত্র পাঁচ ছয় আঙুল প্রশস্ত এক ফালি কৌপীনের মত। বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উপস্থিত আর কাহারও কোনো অসুবিধা দেখিলাম না; বুঝিলাম ইহাই এদেশের প্রথা। স্নান সারিয়া উঠিয়া তিনি এই অবস্থাতেই পরিধেয় বস্ত্র কাচিয়া পরিষ্কার করিলেন; তাহার পর সেইটি পরিধান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

স্নানের পর তীর্থকৃত্য করিতে এই সকল অসুবিধায় বেশ বিঘ্ন ঘটিল। ঘাটে পাণ্ডা আছে, তাহাদের পীড়াপীড়িও আছে; নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার পক্ষে তাহাও কম বিঘ্ন নহে। আমার পক্ষে পাণ্ডার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তীর্থে আসিয়া তাঁহাদের শরণ লইতেই হইবে, কারণ তাঁহারা তীর্থগুরু। অনুষ্ঠানের মন্ত্রে স্থানীয় বিশেষত্বের দরুণ কিছু পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি বাঙলাদেশের মত, তবে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার —সংকল্পের মন্ত্রটি একটু বৃহৎ আড়ম্বরপূর্ণ; পশ্চিম ভারতেও এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। সঙ্গে গঙ্গাজল আনিয়াছিলাম, তাহা কাবেরীতে ঢালিয়া দিয়া কাবেরীর জলে শিশি ভরিয়া লইলাম। পাণ্ডা মহাশয় প্রাপ্তিতে ঠিক সন্তুষ্ট হইলেন না। তাহার জন্য তেমন ভাবি নাই। কিন্তু তীর্থের কাজে যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহা মনের মধ্যে খচ খচ করিতে লাগিল।

স্নান ও তীর্থকৃত্য সারিয়া যখন উঠিয়া আসিলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে, বৈশাখের সূর্য দক্ষিণের আকাশে মাথার উপর উঠিয়াছে। পদতলে অসহনীয় উত্তাপ—পথের কোথাও ছায়ার লেশমাত্র নাই। এই অবস্থায় নদীতীরের পথ অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় আসিলাম। কিন্তু 'বাসের' জন্য খানিকক্ষণ দাঁড়াইতে হইল। এই খানিকক্ষণ একটা অসহনীয় অবস্থায় গিয়াছে। উপরের সূর্যের তাপ কোনোমতে সহ্য করিতে-ছিলাম। কিন্তু নিম্নে কংক্রীট-ঢালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব বোধ হইতেছিল। 'বাসে' উঠিয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। সহরতলীর পথ দিয়া 'বাস' একেবারে মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীরঙ্গম মন্দির

শ্রীরঙ্গম। বিরাট ও বিশাল মন্দির। কতখানি বিরাট তাহা না দেখিলে উপলব্ধিতে আসে না। দ্রুত পরিদর্শনে যতদূর বোঝা গেল, সাতটি এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের প্ল্যানে সমগ্র মন্দিরটি পরিকল্পিত এবং সর্বাভ্যন্তর বৃত্তের মধ্যে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। প্রত্যেকটি বৃত্তের প্রবেশপথে এক একটি তোরণ, প্রত্যেকটি তোরণের সহিত একটি করিয়া প্রাচীরের বেষ্টনী এবং দুই দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তরে বাজারের মত ঘন জনবসতি। মূল মন্দিরটি খুব উচ্চ বা বৃহৎ নহে, কিন্তু তোরণদ্বারগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীরের বেষ্টনী সু-উচ্চ ও সুবিশাল। পরপর সাতটি তোরণ অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথম তোরণপথটি বন্ধ করিয়া দিলে সমগ্র মন্দিরটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দুর্গ বা শহর। মূল মন্দিরটি এমনভাবে গঠিত যে, নির্দিষ্ট একটি দ্বার ছাড়া বাহির হইতে কোনো দিক দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশের উপায় নাই। আকাশের দিকেও উহা সম্পূর্ণ আবৃত—বিশাল সে প্রস্তরাচ্ছাদন; কেবল দেওয়ালের ঊর্দ্ধাংশে বায়ু-প্রবেশের জন্য কতগুলি ঘুলঘুলির মত ছিদ্র আছে। তোরণপথগুলি সোজা একসূত্রে অবস্থিত। সহজেই চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু কেহ সঙ্গে করিয়া লইয়া

না আসিলে মূল মন্দিরে প্রবেশ করা ও উহার অভ্যন্তরস্থ দেবস্থানে উপস্থিত হওয়া দুঃসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে মন্দিরে প্রবেশের সময় আমার একজন সঙ্গী জুটিয়াছিল, মূল মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি। তোরণপথ দিয়া আসিবার সময় মূল মন্দিরের প্রবেশপথে লক্ষ্য করিলে মনে হয়, পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অগ্রসর হইলে দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা নহে, পথটি সোজা না গিয়া ডাহিনে বাঁয়ে ঘুরিয়া গিয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, একটি বিশাল গরুড়মূর্তি এমনভাবে বসানো, যাহার পশ্চাৎদিক পথের অবরোধের মত দেখায়। মন্দিরের রীতি অনুসারে দেবতার সম্মুখে বাহন উপবিষ্ট থাকিবে। গরুড়-মূর্তিটীও ঠিক গর্ভগৃহের সোজাসুজি স্থাপিত। কিন্তু ইঁহার পাশ দিয়া ঘুরিয়াও দেবতার নিকট সোজা পৌঁছিবার উপায় নাই। একটি পার্শ্বদ্বারের মধ্য দিয়া অল্প-পরিসর,আলোকহীন এক অভ্যন্তরীণ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা দেবগৃহের ঠিক সম্মুখস্থ চত্বর। এখান হইতে একটি দ্বার অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইয়া আর একটি দ্বারের নিকটে পৌঁছিলে তবে দেবতার দর্শনলাভ হয়। এই শেষ দ্বারটীই গর্ভগৃহের দ্বার—গৃহমধ্যে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটী দ্বারেই পূজকদিগের অবরোধ। অর্ঘ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তদনুযায়ী লোক ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সমগ্র মন্দিরটিতে কারুকার্যের বাহুল্য। বাহুল্য এত বেশী যে, বর্ণনায় শেষ করা যায় না। স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত পরিদর্শনে তাহা দেখিয়া ওঠাও যায় না। তবে কোথাও মন্দির পরিদর্শনে

গেলে আর কিছু দেখিবার সময় হউক আর নাই হউক, মন্দির-গাত্রে খোদিত দেবমূর্তিগুলি মোটামুটি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করি। সেইভাবে প্রথম তোরণদ্বারের উর্ধ্বে স্থাপিত একটি গণেশ-মূর্তি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গণেশের নানারূপ মূর্তি দেখিয়াছি—বিশেষতঃ ভুবনেশ্বরে। কিন্তু ক্রোড়ে পত্নী লইয়া উপবিষ্ট গণেশ-মূর্তি কোথাও দেখি নাই। দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল আরও দুইটি বস্তু—সুবর্ণমণ্ডিত সু-উচ্চ ধ্বজ-দণ্ড, যাহা দক্ষিণী মন্দিরের বিশেষত্ব এবং যাহাকে বাঙলায় আমরা বলি সোনার তালগাছ, আর মূল মন্দিরে দেবগৃহের দ্বারের দুই পার্শ্বে বিশাল দ্বারপালমূর্তি। মন্দিরের দেবতা বিষ্ণু, দ্বারপালেরাও বিষ্ণুর স্বরূপ।

শ্রীরঙ্গম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রী-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ এবং "আলবন্দার" বা "আলওয়ান্দার" অর্থাৎ শাসনকর্তা আখ্যা-ধারী জগদ্‌গুরুদিগের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। দার্শনিক ও ধার্মিক সমাজে রামানুজাচার্যের নামই প্রখ্যাত। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী যামুনা-চার্য বা যামুন মুনিও কম প্রখ্যাত নহেন। রামানুজাচার্য যামুন মুনির পৌত্রী কান্তিমতীর পুত্র এবং তাঁহারই শিষ্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা যামুনাচার্যের নামের সহিত নিশ্চয়ই সুপরিচিত। চরিতামৃতকারকে এবং রূপ, সনাতন, রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্ষদগণকে কথোপকথনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যামুনাচার্য-স্তোত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে দেখা যায়।

দেব-দর্শন

মূল মন্দিরের অভ্যন্তরীণ চত্বরে যখন পৌঁছিলাম, তখন দেবগৃহের দ্বার অবরুদ্ধ—ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। বৈশাখের অসহনীয় গরম। চতুর্দিক অবরুদ্ধ—তাহার উপর বিপুল জনতা। কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহার কোনো স্থিরতা নাই। এক মন্দির-পরিচারক দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে বেত্রাঘাতের মত ঘনঘন চটাচট শব্দ করিতেছে। ভোগ আসিবে তাহারই সতর্কধ্বনি। ক্রমশঃ চত্বরের এক পার্শ্বেই ভোগের আয়োজন হইল। যথাবিহিত আড়ম্বরের সহিত দেবতার ভোগ-মূর্তি আসিলেন এবং ভোগ সমাপনান্তে চলিয়া গেলেন, ভোগের কিয়দংশ দেবগৃহের মধ্যেও প্রেরিত হইল; ভাবিলাম, এইবার দ্বার খুলিবে, কিন্তু খুলিল না। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দ্বার খুলিল বটে, কিন্তু যখন লোক ছাড়িতে আরম্ভ হইল, তখন দেখিলাম আমার যাইবার বিঘ্ন আছে। অনুমতি-পত্র দেখিয়া লোক ছাড়া হইতেছে। সম্ভবতঃ মাদ্রাজের দেবোত্তর আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্দিরের সেরেস্তায় দর্শনী জমা দিয়া অনুমতি-পত্র লওয়া হইয়াছে। এইরূপ একটা ব্যবস্থা আছে জানিতাম। কিন্তু আসিবার সময়ে তাড়াতাড়িতে উহা খেয়াল ছিল না, সেরেস্তা কোন্‌খানে তাহাও জানিতে পারি নাই আর যখন আসিয়াছি, তখন অনুমতিপত্র লইবার সময়ও ছিল না। দেবতার দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে, বড় বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ভিড়ের দরুণেই

হউক বা যে কারণেই হউক, আমার যাওয়াতে কেহ বাধা দিল না। অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া গর্ভগৃহের ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বহু লোকের এবং বহু কালের আরাধিত দেবমূর্তি সম্মুখে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। গৃহের অভ্যন্তরে বিশাল বিষ্ণুমূর্তি শ্রীরঙ্গশয়নে—পুন্নাগ বা তিল তৈলের স্তিমিত আলোক জ্বলিতেছে—সর্বাংশ একবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। গৃহদ্বারের সঙ্কীর্ণতার সহিত মূর্তির বিশালতার তুলনা করিয়া স্বভাবতঃই বিপুল বিস্ময় জাগিল। পূজারী বিশেষ প্রণামী লইয়া এক হস্তে প্রদীপ্ত মশাল ও অপর হস্তে যষ্টির সাহায্যে মূর্তির সর্বাংশ দেখাইতে লাগিলেন—শায়িত মূর্তির পদতলে শ্রীদেবী ও ধরাদেবী। বাঙলাদেশে আমরা বিষ্ণুমূর্তির সহিত কেবলমাত্র শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান দেখিতেই অভ্যস্ত, দুই দিকে দুই মূর্তি থাকিলে —লক্ষ্মী, সরস্বতী। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তির সহিত লক্ষ্মী ও ধরিত্রীর অবস্থান, ইহাও প্রামাণিক, ইহাও প্রচলিত। বরাহ অবতারে বিষ্ণু পৃথিবীকে অসুরের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষ্যেই ধরিত্রীর সহিত তাঁহার পরিণয়। সেই জন্য পৃথিবীর নাম "মাধবী"—মাধবের পত্নী। "মা-ধব" কথাটীর অর্থ "মা" অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্বামী। কিন্তু "মাধবী" বলিলে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, বুঝায় পৃথিবীকে।

মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনা হইতেই যামুনাচার্য-স্তোত্র স্মরণে আসিল—

"নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে

নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে"

আবিষ্ট অবস্থায় পাঠ করিতেছিলাম—এক বালক পূজারীর রূঢ় উক্তিতে আবেশ ভাঙ্গিল, বলিল—বাবু ঐদিকে সরিয়া গিয়া ধ্যান করুন। দ্রুতপদে মন্দির হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

পথের ক্লেশ

বাহিরে অসহ্য উত্তাপ। 'বাস' দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে উঠিয়া যেন একটা আশ্রয় পাইলাম। বাসে উঠিয়া দেখিলাম একজন যাত্রী দুইটি বড় ঝুড়িতে ভর্তি ফুল লইয়া যাইতেছে—এক ঝুড়িতে লাল পাঁচ-পাপড়ি করবী এবং অপর ঝুড়ি পরিপূর্ণ ডবল যুঁই বা ডবল বেলা। কেমন করিয়া বলিতে পারি না—স্তূপীকৃত স্নিগ্ধতার এই সমাবেশ চোখে পড়িবামাত্র রৌদ্রতাপের প্রদাহ যেন অনেকটা কমিয়া গেল। স্পর্শে বা ঘ্রাণে না হইলেও, দর্শনের পথেই যেন সেই স্নিগ্ধতা শরীরে ও মনে সঞ্চারিত হইল। স্থির হইয়া বসিয়া ইঙ্গিতে যাত্রীটীর নিকট ফুলের নামটা জানিতে চাহিলাম। করবীর নাম কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না; বেল ফুলগুলির দিকে দেখাইয়া বলিল—"মল্লিয়ম্"। দেখিলাম নামটা প্রায় আমাদের ব্যবহৃত নামেরই কাছাকাছি।*

* বেলফুলের সংস্কৃতভাষায় নাম 'মল্লিকা'; বাঙলা ভাষায় ইহাই ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় বেলফুলকে 'মল্লী'ও বলা হইয়া থাকে।

'বাস্' হইতে যখন নামিলাম, মধ্যাহ্নবেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে ; পথ এমন উত্তপ্ত—পায়ে একেবারেই সহ্য হইতেছে না। দুই পা ক্রমাগত ওঠা-নামা করিতে করিতে যেন এক প্রকার নৃত্য সুরু হইয়া গেল। অথচ বাসায় যাইতে বেশ খানিকটা পথ ঘুরিয়া যাইতে হইবে। সম্মুখের একখণ্ড খোলা জমির উপর দিয়া পথ সংক্ষেপ করিবার উপায় ছিল। কিন্তু তাহা উচু-নীচু এবং মধ্যে এক নালা পার হইয়া যাইতে হইবে। তা হউক, সেই পথেই যাওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু দ্রুত চলিতে ও উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া তাল রাখিতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। বালুকায় ও কাঁকরে দুই হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তথাপি অসহ্য উত্তাপ এড়াইবার জন্য প্রায় দৌড়াইয়াই বাসায় পেঁ ৗছিলাম। প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আইওডিন" আছে ? কথাটা কেহ বুঝিল না। কোনোমতে বুঝাইতে না পারিয়া হাতে ক্ষত দেখাইলাম। তখন একজন বলিল— 'টিংচার' (Tincture) ? কথাটা বোঝান হইল বটে, কিন্তু টিংচার পাওয়া গেল না। নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি এমন সময়ে সহসা স্মরণ হইল কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইবার পূর্বে একটা মলমের টিউব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনেই পকেটে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাই এখন বিশেষ কাজে আসিল।

ক্ষতবিক্ষত হস্ত। আহারকার্য তখনও বাকী। কষ্টসাধ্য হইলেও কোনোমতে উহা সমাধা করিতে হইল। আহার সমাপ্তির পর বোধ করিলাম মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। খানিকক্ষণ বিশ্রাম লইতে হইল জম্বকেশ্বর মন্দিরে এবং কাবেরী-

তীরবর্তী পাহাড়ের উপর গণেশের স্বুবর্ণমন্দিরে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিলাম। উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া মার্জনা চাহিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা মনকে প্রবলভাবে অধিকার করিল, অস্থিরতা দেখা দিল। একেবারে একাকী হইয়া পড়িয়াছি, ইহা যেন সহ্য হইতেছিল না। ত্রিচিনপল্লী হইতে মাদ্রাজে বিমান যাতায়াত করে, দ্রুত ফিরিয়া যাইবার উপায় আছে। কিন্তু এখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলে সে উপায় আর থাকিবে না। মনকে খানিকটা শান্ত করিয়া আনিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। ফিরিয়া যাইব না—ইহা স্থির হইবার পর পরবর্তী ভ্রমণ তালিকা নির্দিষ্ট করিলাম। ত্রিচিনপল্লী হইতে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর এবং তাহার পর মাতুরা। মাদ্রাজ হইতে আসিবার সময়ে মাতুরার একটি ঠিকানা আনিয়াছিলাম। সেই ঠিকানায় একখানি পত্র দিয়া জানাইলাম যে, শনিবার প্রাতে ৯।১৪ মিনিটে মাতুরায় পৌঁছিতেছি। অনিশ্চিতের ভরসা। তথাপি চিঠিটা দেওয়ার কথা মনে হইল। কি জানি কাজে আসিতেও পারে।

বাঙালী যুবকের সাক্ষাৎ

রামেশ্বরের গাড়ী রাত্রি দশটায়। ছোকরাটি বলিয়া গিয়াছে রাত্রি আটটায় আসিয়া লইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া করিব কি? একটু ভ্রমণে বাহির হইলাম। মনের অধীরতা তখনও থামে নাই। দেহে ক্লান্তি ও অবসন্নতা। হাঁটিতে হাঁটিতে

স্টেশনের দিকে চলিলাম। আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম পথচারী যুবকদের মুখ এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম তাহাদের ভাষা। আশা—যদি কোনো বাঙালী যুবকের সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়। এমনিভাবে চলিয়া স্টেশনের সম্মুখে রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি। সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলাম সেই পরিচিত সম্ভাষণ —"আপনি কি বাঙালী ?" এবারে আর ততটা আশ্চর্য হই নাই। মন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। যে যুবকটির সহিত দেখা হইল, তাহার নাম তারকনাথ সিংহ। বাড়ী ঢাকা, বক্সী বাজার, তাহাদের পরিবার বর্তমানে রহিয়াছে চেতলায়। তাহার সহিত আলাপে জানিলাম ১০।১২টি বাঙালী যুবক এখানে আছে, মাতুরাতেও আছে দুইজন—সন্তোষ চক্রবর্তী ও ধীরেন দাস ; 'ট্রেণস্ ক্লার্ক'-এর কাজ করে। তাহাদের জীবনযাত্রার সন্ধান লইলাম, বৃদ্ধাচলমের যুবকদের অপেক্ষা ভাল। থাকে স্টেশনের সন্নিকটস্থ রেলওয়ে কোয়ার্টারে এবং আহার্য গ্রহণ করে সকলে মিলিয়া নিকটে এক হোটেলে—নাম, মালাবার হোটেল। কিছুক্ষণ আলাপের পর যুবকটি হোটেলে যাইবার জন্য বিদায় লইল। বলিয়া দিলাম—আহারের পর বন্ধুদের লইয়া স্টেশনে আসিও। যতক্ষণ থাকি তোমাদের সহিত আলাপ করিব।

তারক তাহার গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। অন্ধকার হইয়াছে। পথের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাসায় ফিরিলাম এবং দেনা-পাওনা মিটাইয়া বিদায় লইয়া পুনরায় স্টেশনের পথে বাহির হইয়া

পড়িলাম। ছোকরা কুলীটির আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার বিলম্ব দেখিয়া বাসারই একটি লোককে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। পথে ছোকরা কুলীটির সহিত দেখা। তখন বাধিল উভয়ের মধ্যে বচসা। যেখানে বাধিল সেখানে পথ অন্ধকার এবং একেবারে জনহীন। বচসার ভাষা বুঝি না, কিছু বুঝাইতেও পারি না, কি বলিয়া থামাইব? ইহার পর যদি এই নির্জন অন্ধকারে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি বাধিয়া যায়,—রামেশ্বর যাওয়া তো পণ্ড হইবেই পুলিশের হাতে পড়িতেও হইতে পারে। অগত্যা প্রথম ব্যক্তির সহিত যাহা চুক্তি হইয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলাম। সে স্যুটকেসটি ছোকরার হাতে ছাড়িয়া দিল। স্টেশনে আসিয়া সন্ধান লইলাম সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট পাইব কি না। পরামর্শদাতারা বলিলেন, ইণ্টার ক্লাসের টিকিট লউন, গাড়ী আসিলে যদি জায়গা থাকে সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট পাইবেন। গাড়ীর তখনও দেরী, টিকিট কিনিয়া ছোকরাটিকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছি—এমন সময়ে প্লাটফরমে দেখিলাম সুপরিচিত জনৈক প্রতিবেশীকে। বড় আনন্দ হইল, আশা হইল রামেশ্বর-যাত্রার একজন সঙ্গী মিলিবে। সানন্দে তাঁহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ জানাইলাম। কিন্তু শুনিলাম তিনি রামেশ্বর হইতে ফিরতি ট্রেণে এইমাত্র আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। আশার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে বন্ধুদের লইয়া তারক আসিল, সঙ্গে স্থানীয় এক সহকর্মী—নাম সান্তনম্। বৃদ্ধাচলমে যুবকদের নিকট জীবনযাত্রার যে অসুবিধার কথা শুনিয়াছিলাম, এখানেও

তাহাই—আহার্য ও ভাষা। আহার-সমস্যা সমাধানের জন্য একজন স্বীয় পত্নীকে আনাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে দেখা দিয়াছে আর এক সমস্যা। স্বামীটি কাজে চলিয়া গেলে মহিলাটি সারাদিন কাহারও সহিত কথা কহিতে না পারিয়া মৌনব্রত পালনে বাধ্য হন। দিনের পর দিন ইহা চলিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধাচলমে যুবকদের যাহা বলিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই বলিলাম—সমস্ত সহ্য করিয়া ও মানিয়া লইয়া চলিতে হইবে, টিকিয়া থাকা চাই, জীবনের পরীক্ষায় পরাজয় স্বীকার করিও না। আমাদের সম্মুখেই লাইনের উপর একসার বগী দাঁড়াইয়াছিল; আলাপ করিতেছি, গাড়ী হইতে দুইজন যুবক নামিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, পরিধানে সুপরিচিত নীল কোর্তা, হাতে গাড়ী সাফ করিবার বুরুষ। পরিচয়ে জানিলাম একজনের পরিবার রেফিউজি ক্যাম্পে। দুঃখের অবস্থা; কিন্তু দেখিয়া আনন্দ হইল, ভরসা হইল, বলিলাম, 'তোমরা পারিবে।' তাহাদের স্থানীয় সহ-কর্মীটির সহিত আলাপ করিলাম। সহায়তা করিবার আগ্রহ তাহার রহিয়াছে, কিন্তু বড় বেশি মুরুব্বিয়ানার ভাব। বেঞ্চে আমার পাশেই বসিয়াছিলেন সরকারী তকমালাগানো-পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি। পরিচয়ে জানিলাম, স্থানীয় পুলিশ সুপার। আমাদের আলাপ তিনি এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন—'ইহারাই কি পূর্ববঙ্গে মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে?' কথাটা গায়ে বিঁধিল, বলিলাম, 'ঠিক তাহা নহে, ইহারা ভারত-খণ্ডনের বলি।'

ট্রেণ আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। যুবকদের কাজ ছিল। তাহারা বিদায় লইল। গাড়ী যখন আসিল তখন সেকেণ্ড ক্লাসে জায়গা খুঁজিবার সময় নাই। ইণ্টার ক্লাসেই উঠিয়া পড়িলাম এবং উপরের বাঙ্কে একটু শুইবার জায়গা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলাম। পূর্বরাত্রি বসিয়া বসিয়াই কাটিয়াছিল। এবার শয়নের সুবিধা পাইলাম। এ ভ্রমণে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর হইতে পারে না।

ধনুষ্কোটি

শুক্রবার। যখন ভোর হইল তখনও গাড়ী চলিতেছে। উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বসিলাম। কামরায় আমার সহযাত্রী সস্ত্রীক এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এবং, স্ত্রী ও অনেকগুলি পুত্রকন্যা সহ, অপর এক ভদ্রলোক, পরে জানিয়াছিলাম মারাঠী। কাহারও সহিত আলাপ হইল না। বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। দুই দিকে প্রসারিত শ্যামল ক্ষেত্র আর ঘন নারিকেলবন। রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সদ্য-বর্ষণের চিহ্ন এখনও বর্তমান। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে জল জমা হইয়া পল্বলের সৃষ্টি করিয়াছে—কোথাও বহিয়া যাইতেছে। ভ্রমণ করিতে করিতে বহুবার যাহা মনে হইয়াছে এখানেও পুনরায় তাহা মনে হইল—ভারতে প্রকৃতির রূপটা মোটের উপর সব জায়গাতে একই। কথাটা বিশেষভাবে মনে হইয়াছে কুসুমশোভার দিকে লক্ষ্য করিয়া। সর্বত্রই সেই চম্পক—মল্লিকা—যূথী—করবী—জবা—আকন্দ ও ধুস্তুর। পথের পার্শ্বে, বালুকার স্তূপে অত্যন্ত অযত্নে আকন্দ ও ধুতুরা ফুটিয়া আছে—শুভ্র ও নীলাভ শুভ্রের অপরূপ নিরাভরণ গাম্ভীর্য্য। প্রাচীরের উপর দিয়া ঘনশ্যাম পত্রপুঞ্জের মধ্যে বিকসিত রক্ত-জবার শোভা—কোথাও ঝুমকাজবা অবনত হইয়া পড়িয়াছে। করবীর, আমরা যাহাকে পদ্মকরবী বলি, উন্নত হইয়া আপনাকে

প্রকাশ করিতেছে ; আর পাঁচ-পাপড়ী করবী—লাল ও সাদা—গুচ্ছের মত হইয়া উঠিয়াছে। অপরিচিত ফুলও যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে। তবে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে রক্তজবার তুলনা নাই। ইহার স্থান কোথাও সীমাবদ্ধ নহে—উদ্যানে, বনভূমিতে, প্রাঙ্গণে, চত্বরে ও দেবায়তনে সর্বত্র ইহার সমান অধিকার—সর্বত্র ইহাই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সর্বত্র ইহার প্রাধান্য অপ্রতিহত। ইহা যেন উদ্ভিদ্‌রাজ্য অতিক্রম করিয়া আমাদের জীবনরাজ্যের মধ্যেই আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। রাঙাজবার উল্লেখ করিতে অন্তর্লোকে যে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে অন্য কোনো ফুল সে যোগ্যতা পায় নাই। আমার কাজ ছিল প্রত্যেক জায়গায় সুযোগ পাইলেই ফুলের স্থানীয় নাম জিজ্ঞাসা করা—দেবপূজায় কাহার কিরূপ সমাদর তাহার সন্ধান লওয়া। ত্রিচিনপল্লীতে পদ্মকরবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জনৈক তামিল ব্রাহ্মণ বলিলেন—"রক্তপুষ্পম্"। কিন্তু ধনুষ্কোটির পথে পাম্বানে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার অন্য নাম শুনিয়াছিলাম—এখন স্মরণ হইতেছে না। শক্তিপূজায় জবার প্রাধান্যের কথা আমাদের সুবিদিত। ত্রিবান্দ্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম এখানেও শক্তিপূজায় জবার বিশেষ মর্যাদা।

রামেশ্বরের সেতু

গাড়ী চলিতেছে। এতক্ষণে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছিলাম। ক্রমশঃ মূলভূভাগের সীমান্তে আসিয়া পড়িলাম।

গাড়ী মূল ভূভাগ ও রামেশ্বর দ্বীপের মধ্যবর্তী সেতুর উপরে উঠিল। এই সেতুটি—দৈর্ঘ্যে ৬৭৪০ ফুট, মধ্যস্থলে ২২০ ফুটের একটি অংশ ইচ্ছা করিলে সরাইয়া দেওয়া যায় এবং সেই পথে জাহাজ যাতায়াত করে। সেতুটি যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার নাম 'মণ্ডপম্' এবং শেষ হইয়াছে 'পাম্বান্' স্টেশনে। মধ্যবর্তী প্রণালীটির নাম পাম্বান্ প্রণালী, ইহা মান্নার উপসাগরকে পক্ উপসাগরের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। প্রণালীটি অগভীর—সর্বাপেক্ষা গভীর অংশে জল ১২ ফুট মাত্র; এই অংশ দিয়াই সেতু খুলিয়া জাহাজ যাতায়াতের ব্যবস্থা। মণ্ডপম্ ষ্টেশনের দিকে প্রণালীটি ভরাট হইয়া উঠিতেছে। সেতুটির ঠিক নিম্নেই জলের মধ্যে দেখা যাইতেছে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড—পুরাতনকালের কোনো সেতুর ধ্বংসাবশেষ। বস্তুতঃ রেলওয়ে ব্রীজটি ঠিক এই পুরাতন সেতুর উপর দিয়াই বরাবর নির্মিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহার গঠনও বিচিত্র। প্রস্তর-সেতুটি জলের তলায় বসিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও মনে হয় উহার উপর দিয়া হাঁটিয়া অনেকদূর যাওয়া যায়—অদ্ভুত গঠন-নৈপুণ্য।

জলমধ্যে এই পুরাতন সেতুটিকেই 'শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর' ধ্বংসাবশেষ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সেতুটির অবস্থান দেখিয়া উল্লিখিত কিম্বদন্তী সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আমার মনে উঠিতেছিল তাহা প্রকাশ পাইল সহযাত্রী মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের পত্নীর মুখ দিয়া। ভদ্রলোকটি যখন পত্নীর কাছে ইহাকে 'শ্রীরামচন্দ্রের সেতু' বলিয়া বর্ণনা করিতেছিলেন তখন মহিলাটি সহসা বলিয়া

উঠিলেন—'রামচন্দ্র তো সেতু বাঁধিয়াছিলেন লঙ্কায় যাইবার জন্য ; এ সেতু তো এ পাড়ে।' মহিলাটির কথায় তাঁহার স্বামী নিরুত্তর হইলেন, কারণ, কথাটা সত্য। রামেশ্বর দ্বীপটি মূল ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও এ পাড়েরই সামিল ; ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যবর্তী প্রণালীর মূল অংশ রামেশ্বর দ্বীপের পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ধনুষ্কোটিতীর্থ বলিয়া যাত্রীরা যেখানে স্নান করে তাহা এই দ্বীপটির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। রামেশ্বর দ্বীপের পর প্রণালীর মধ্যে প্রস্তরসেতুর কোনো চিহ্ন প্রত্যক্ষ নহে। অগভীর জলের মধ্যে সারি সারি কয়েকটি দ্বীপের মত আছে, সেইগুলিকেই শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর ধ্বংসাবশেষ বলা হইয়া থাকে।* মারোয়াড়ী মহিলাটির প্রশ্নে তাহার স্বামী নিরুত্তর হইলেও উহার একটা জবাব হইতে পারিত। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধার করিয়া ফিরিতেছেন তখন সমুদ্র আপনার বন্ধনমোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রের অনুরোধে লক্ষণ ধনুষ্কোটি দিয়া সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—ইহাই প্রচলিত কাহিনী। এমন হইতে পারে লক্ষ্মণ লঙ্কা হইতে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত সেতুর মূল অংশ অপসারিত করিয়াছিলেন ; যাহা এ পাড়ে ভারতের সহিত সংলগ্ন তাহারই একটু অংশ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেকথা বলিলেও প্রশ্ন উঠিবে। শ্রীবামচন্দ্রের ইঞ্জিনীয়ার নল সেতু বাঁধিতে পাথর ও পাহাড় গোটা গোটা ব্যবহার করিয়াছিলেন। রামেশ্বর

---

* মানচিত্রে প্রচলিত নাম "Adam's Bridge"

যাইতে সেতুর যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় তাহার প্রস্তর-খণ্ডগুলি আকারে প্রকাণ্ড হইলেও বেশ চৌরস করিয়া কাটা। বস্তুতঃ রামেশ্বর মন্দির দেখিবার পর এই সেতুর সম্বন্ধে আমার নিজের একটা ধারণা হইয়াছিল—মন্দির যাহার তৈয়ারী সেতুও তিনিই তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তর এবং সেতুতে ব্যবহৃত প্রস্তর একই শ্রেণীর এবং একই ধরণের কাটা।

পাম্বান্ স্টেশনে পাণ্ডা

সেতু পার হইয়া যে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামে তাহার নাম 'পাম্বান্' পূর্বেই বলিয়াছি। এ অঞ্চলের প্রতি ষ্টেশনেই ডাব-নারিকেলের প্রচুর আমদানী। পাম্বান্ হইতেই রেল-লাইন বিভক্ত হইয়াছে—মূল লাইন গিয়াছে ধনুষ্কোটির দিকে, একটা শাখা লাইন গিয়াছে রামেশ্বর-মন্দিরের দিকে। পাম্বানে পৌঁছিয়া সমস্যা দেখা দিল। গৃহ হইতে যখন যাত্রা করি, তখন সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলাম, ধনুষ্কোটিতে স্নান সারিয়া মন্দির দর্শনে যাইব; মন্দির ও স্নানস্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে তখন কোন ধারণা ছিল না। পাম্বানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, মন্দির হইতে স্নানস্থান রেলের পথ; তখন সমস্যা দেখা দিল একাধিক—এক সমস্যা হইল মন্দির ও স্নানঘাটে যাতায়াতে রেলের যোগাযোগ রাখা, দ্বিতীয় সমস্যা ঘটাইল রামেশ্বরের পাণ্ডারা, তৃতীয় সমস্যা, পরের দিন অর্থাৎ শনিবার

সকালেই মাদুরায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা। গাড়ী সোজা ধনুষ্কোটিতে চলিয়াছে, অনুমান নয়টায় পৌঁছিবে। শুনিলাম বারোটাতে একটা ফিরতি-গাড়ী আছে; তাহাতে ফিরিতে পারিলে পাম্বানে রামেশ্বরের ট্রেণ ধরা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনিলাম যে, ধনুষ্কোটি স্টেশন হইতে স্নানঘাট অনেকটা দূর, বালির উপর দিয়া যাইতে হয়। অতখানি পথ যাওয়া-আসা করিয়া দুপুরের গাড়ী ধরিতে পারিব কি না। আমার মনে দৃঢ়তা ছিল পারিব। কিন্তু গোল বাধাইল স্টেশনে রামেশ্বরের পাণ্ডারা। পাম্বানে গাড়ী একটু বেশিক্ষণ থামে, পাণ্ডারা গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রী সংগ্রহ করে। কয়েকজন পাণ্ডা আমাদের গাড়ীতে উঠিল এবং আমরা নামিতে না চাওয়ায়, মহা কলরব সুরু করিয়া দিল। তাহারা বলিল, 'ধনুষ্কোটি হইতে দুপুরের গাড়ী কখনই ধরিতে পারিবে না আর তাহা হইলে আজ আর দর্শন পাইবে না; কারণ পরবর্তী গাড়ী ৩টায়, সে গাড়ীতে যখন পৌঁছিবে তখন দর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে। আজ শুক্রবার মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠান।' পাণ্ডাদের কথা ঠিক হইলে ভ্রমণ-তালিকাই গণ্ডগোল হইয়া যায়। এতদূর আসিয়া দর্শন না করিয়া যাইতে পারিব না অথচ দর্শনের জন্য যদি আজ থাকিয়া যাইতে হয় কাল মাদুরা যাওয়া হয় না। বিব্রত বোধ করিলাম বেশ। তথাপি তীর্থস্নান না সারিয়া দেবতাদর্শনে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, নামিবার জন্য পাণ্ডাদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও স্থির হইয়া বসিয়াই রহিলাম। কিন্তু আমি স্থির থাকিলেও পাণ্ডা মহাশয়েরা সহযাত্রী মারাঠী ভদ্রলোকটিকে বিচলিত করিলেন। দেখিলাম তিনি নামিবার

উদ্যোগ করিতেছেন; সকাল হইতে সমস্ত পথটা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে আসিতেছিলাম। এই অপরিচিতরাজ্যে তিনিই এখন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার কথা বুঝিতে পারেন একং লোকের কথা আমায় বুঝাইয়া দিতে পারেন। পাণ্ডাদের পাকচক্রে পড়িয়া এমন সঙ্গী হারাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। তাঁহাকে নামিবার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া মনে মনে বিশেষ বিচলিত হইলাম, বাহিরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"আপনি নামিতেছেন?

তিনি বলিলেন—"কি করি পাণ্ডারা বলিতেছে এখন না নামিলে দর্শন পাইব না আমার সঙ্গে গঙ্গাজল আছে; রামেশ্বরের মাথায় চড়াইতে হইবে।"

বলিলাম—"গঙ্গাজল আমারও সঙ্গে আছে। হরিদ্বার গিয়াছিলাম, ব্রহ্মকুণ্ডের জল আনিয়াছি। সেই জল চড়াইব বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আপনি তো এতক্ষণ বলিতেছিলেন যে সেতুবন্ধ-স্নান সারিয়া রামেশ্বরের দিকে আসিবেন।"

"হাঁ, তাহা বলিয়াছিলাম বটে। কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডাদের কথা শুনিতেছেন তো। আপনিই বলুন না কি করি।"

বলিলাম—"আমাকে বলিতে হইবে কেন? আপনি নিজেই তো ঠিক করিয়া লইতে পারেন। আপনি যখন গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন মনে সঙ্কল্প কি ছিল?"

"সঙ্কল্প ছিল ধনুষ্কোটিতে স্নান সারিয়া দেববদর্শনে যাইব।"

বলিলাম—"তবে মধ্যপথে পাণ্ডাদের কথায় সঙ্কল্পভঙ্গ করিতেছেন কেন ?"

কথাটা বলিবামাত্র ভদ্রলোক সোজা হইয়া বসিলেন—বলিলেন—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি নামিব না। চলুন প্রথমে ধনুষ্কোটিতেই যাইব।"

আমি বাঁচিয়া গেলাম।

গাড়ী ধনুষ্কোটি চলিল। দুই দিকেই দূর-প্রসারিত বালুকাপ্রান্তর। বামদিকে বালুকাপ্রান্তর ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না কিন্তু দক্ষিণ দিকে প্রান্তরের শেষে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বুঝিলাম রামেশ্বর দ্বীপের যে অংশ অন্তরীপের মত অগ্রবর্তী হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে গাড়ী তাহারই দক্ষিণ সীমানা দিয়া যাইতেছে। সমুদ্রকে নানারূপে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি গঙ্গাসাগরে—দেখিয়াছি পুরীতে—দেখিয়াছি পণ্ডিচেরীতে—কিন্তু এখানে যেন উহা এক নবরূপে দেখা দিতে লাগিল।

ধনুষ্কোটি তীর্থে

ধনুষ্কোটিতে পৌঁছিয়া ৵০ খরচে পার্সেল ক্লার্কের নিকট স্যুটকেসটি জমা দিয়া রসিদ লইলাম ; স্নানঘাটে পৌঁছিবার এবং ফিরিয়া দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে রামেশ্বর যাইবার উপায় সম্বন্ধেও তাঁহার পরামর্শ লইলাম। কেহ কেহ বলিয়া দিয়াছিল, গোযানে যাইতে। কিন্তু তাহাতে বালির উপর দিয়া যাতায়াতে সময় লাগিবে অনেক আর ভাড়া ৫৲। হাঁটিয়া গেলে একটু

কষ্ট হইবে বটে কিন্তু দ্রুততর ফিরিতে পারিব। আমার নিকটে তখন তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। সুতরাং হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। সঙ্গী মারাঠি ভদ্রলোকটিও সম্মত হইলেন। আমি একা এবং তিনি সপরিবারে, একত্রে রওনা হইলাম এবং বালুর উপর দিয়া অন্ততঃ মাইল দুই পথ হাঁটিয়া তীর্থস্থানে পৌঁছিলাম। এই লোকালয়হীন সমুদ্রতীরে পাণ্ডারা সারি সারি ঘাটে বসিয়া আছেন দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইল।

এখানে সমুদ্রের আর এক মূর্তি। স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও অগভীর—তলদেশের বালুকণাসমূহ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—এবং এমন অগভীর যে, অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলেও এক হাঁটুর বেশী জল হয় না। বোধ হইল, হাঁটিয়া অন্ততঃ মাইলখানেক যাইতে পারিলে ডুব দিবার মত জল হয়। কিন্তু ততটা সময় ছিল না, সাহসও হইল না। এতখানি জল ঠেলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা সহজসাধ্য নহে। অগত্যা এখানেও কাবেরীর ব্যবস্থা করিতে হইল। হাঁটুপ্রমাণ জলে দণ্ডবৎ হইবার ভঙ্গীতে ডুব দিয়া স্নান সারিলাম,—দেখিলাম অপর সকলেও তাহাই করিতেছে—বালিতে সর্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া গেল। "সিন্ধুসমীপে যদি কণ্ঠ শুখায়ব"—ইহা সম্ভব বুঝি কিন্তু সমুদ্রের তীরে আসিয়াও যে ডুব দিবার জলের অভাব হইতে পারে তাহা এবার প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের কবিতার ভঙ্গীতে মনে আসিল—

"Water, water everywhere
But not enough to sink"

স্নান সারিয়া তীর্থকৃত্য ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এতীর্থে পার্থক্য আছে। এখানকার পাণ্ডারা দুই দফায় তীর্থকৃত্য করাইয়া থাকেন, এক দফা স্নানের পূর্বে এবং এক দফা পরে। অনুষ্ঠানগুলি মোটামুটি আমার জানা—আমি সংক্ষেপ করিতে চাহিলেও তাঁহারা সংক্ষেপে করিতে দিলেন না। দানের নানা-রকম ফর্দ। তাহার অনেকটা এড়াইলেও ধনুষ্কোটিতে আসিয়া রূপার তীরধনুক দান এড়াইবার উপায় নাই। আগে জানিলে হয়তো তৈয়ারী করাইয়া আনিতাম, এখানে অবস্থা অনুসারে পাণ্ডা মহাশয়ের সনাতন তীরধনুকটিই যথাসম্ভব মূল্যের বিনিময়ে লইয়া দানের পুণ্য সংগ্রহ করিলাম। এখানকার স্নানে, পাণ্ডাদের সঙ্গে ব্যবহারে এবং তীর্থকৃত্যের অনুষ্ঠানে মহা-রাষ্ট্রীয় সঙ্গীটির উপস্থিতি আমার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। তীর্থকৃত্যের পর জননীর নির্দেশমত এখান হইতে কিছু মাটি অর্থাৎ বালি এবং তীর্থোদক সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

স্নানাদি সারিয়া যখন ফিরিতেছি তখন বেলা মধ্যাহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মাথার উপর বৈশাখের সূর্য, পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালুকা। অথচ দ্রুত চলিবার উপায় নাই, বালির উপর পা দ্রুত চলে না, ক্রমাগত বসিয়া যাইতে থাকে। হাতে পরিপূর্ণ এক ঘটি তীর্থজল, সেতুবন্ধের মৃত্তিকা এবং স্নানীয় বস্ত্রাদি। সঙ্গী ভদ্রলোকটির সন্তানদের মধ্যে ছিল একটি শিশু বালিকা। কিছু দূরে আসিবার পর চলিতে অসমর্থ হইয়া বালিকাটি ক্রন্দন সুরু করিল। স্নেহাতুর পিতা তাহাকে কাঁধে চাপাইয়া চলিতে গিয়া নিজেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

বালিকাটিও পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তাঁহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া আসিতে কিছু সময় লাগিল। ষ্টেশনে যখন ফিরিলাম তখন গাড়ীর সময় হইয়াছে। ভদ্রলোক বলিলেন, আহার না করিয়া তাঁহারা যাইতে পারিবেন না ; বৈকালের গাড়ীতে গিয়া আজ রাত্রিতে রামেশ্বরে থাকিবেন এবং পরদিন দর্শনাদি করিবেন। ভদ্রলোক যেরূপ ক্লান্ত এবং সন্তানদিগকে লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। অগত্যা পুনরায় একাকী চলাই সাব্যস্ত করিলাম।

কুলীবন্ধুর উপদেশ

চলিলাম ; কিন্তু বিপদ বাধিল গাড়ী লইয়া। দ্বিপ্রহরের গাড়ী ধনুষ্কোটি হইতে ছাড়ে না। ধনুষ্কোটি "পিয়ার" (পারঘাটা) নামক এক অগ্রবর্তী ষ্টেশন হইতে ছাড়ে। তথায় পৌঁছিতে প্রায় আধ মাইল হাঁটিতে হইবে। পথ জানি না, এদিকে গাড়ীর সময় হইয়া আসিয়াছে। সে এক দারুণ উৎকণ্ঠা। এতক্ষণ রৌদ্রে হাঁটিয়া ক্লান্তি বোধ হইতেছিল কিন্তু তাহা ভাবিবার মত অবসর তখন ছিল না। কি করিয়া গাড়ী ধরিব তাহাই একমাত্র ভাবনা। সেই সমস্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে সহায় মিলিল একটি কুলী। সে কলিকাতায় বড়বাজারে থাকিয়া ৫ বৎসর কাজ করিয়া গিয়াছে, এখন আছে ধনুষ্কোটিতে ; আমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে, বাঙালী। লোকটি আমার নিকট পরিচয় দিয়া আলাপ করিল এবং আমাকে পারঘাটা স্টেশনে দ্রুত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একটি লোক দিল। বিদায় লইবার

সময়ে কুলীবন্ধুটি একটি হিতোপদেশ দিয়া বলিল—'বাবু রামেশ্বরে পাণ্ডার লোকের খপ্পরে যাইবেন না। স্টেশনের সন্নিকটে মহাবীর ধরমশালা আছে তথায় উঠিবেন। সেখানকার ব্যবস্থা চমৎকার, আরামে থাকিবেন। পাণ্ডার লোকের খপ্পরে পড়িলে কষ্ট পাইবেন।' তাহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম এবং তাহার লোকটিকে সহায় করিয়া পারঘাটা স্টেশনে আসিয়া গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে অবস্থায় কোনক্রমে টিকিট লইয়া উঠিয়া বসিলাম। ক্লান্ত ও বিব্রত দেখিয়া গাড়ীর লোকেরা অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত স্থান করিয়া দিল।

(৬)

রামেশ্বর

রামেশ্বরে যাইতে হইবে। পুনরায় ঘুরিয়া পাম্বান্ ষ্টেশনে আসিতে হইল। গাড়ী পাম্বানে পৌঁছিতেই একটি কষ্টিপাথরের মত কালো কিন্তু সুগঠন ও সুদর্শন যুবক আসিয়া জুটিল। রামেশ্বরে যাইব জানিয়া লইয়া সরাসরি আমার স্যুটকেসটি আনিয়া রামেশ্বরের গাড়ীতে তুলিয়া দিল, কুলী লইতে দিল না; পয়সা লইয়া ডাব কিনিয়া আনিয়া কাটিয়া দিল—দেখিলাম ডাবের বাহিরের আকার যেরূপ বৃহৎ ভিতরে খোলটি তাঁহার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। তাহার এই অযাচিত সৌজন্যে প্রীত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে পাণ্ডার লোক, নামটা বলিল, 'কার্তিক'। এখানে বলিয়া রাখি, পাণ্ডারা ও পাণ্ডার লোকেরা হিন্দী বেশ বলে, বাঙলাও মোটমুটি বোঝে, সম্ভবতঃ অন্যান্য ভাষাতেও কিছু অধিকার রাখে। পাণ্ডার লোকেরা কি রকম চতুর ও চৌকস হয়, কার্তিকের এই নাম-পরিচয়ে তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাহার নাম 'কার্তিক' নহে, হইতেও পারে না; স্থানীয় রীতি অনুসারে 'আর্‌মুখম,' 'ষন্মুখম' বা 'সুব্রহ্মণ্যম' হইবে। কিন্তু সে আমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, বাঙালী; সেইজন্য নামের আসল শব্দটি না বলিয়া বাঙলা প্রতিশব্দটি বলিয়াছিল। রামেশ্বরে বাসস্থানে পৌঁছিয়া আমি যখন তাহাকে 'কার্তিক' নামে খোঁজ করিয়াছি কেহ চিনিতে পারে নাই; যখন বলিয়াছি 'আর্‌মুখম্' তখন সকলে বুঝিয়াছে।

খানিকটা সৌজন্যে আর খানিকটা বাঙালী নামের পরিচয়ে লোকটা আমাকে এমন একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলিয়াছিল যে, ধনুষ্কোটির কুলীবন্ধুটির উপদেশ মনে থাকা সত্ত্বেও তদনুসারে কাজ করিতে পারি নাই। রামেশ্বর ষ্টেশনে নামিবার পর আমি মহাবীর ধরমশালায় উঠিব শুনিয়া সে যখন প্রতিকূল হইল তখন তাহাকে ঠেকাইতে পারিলাম না। সে বলিল মহাবীর ধরমশালা মন্দির হইতে দূরে, যাতায়াতে অসুবিধা হইবে। মন্দিরের কাছে আরও ধরমশালা আছে, সেখানে আপনাকে লইয়া যাইতেছি। বলিয়া সে আমাকে উত্তরের অবকাশ দিল না; একেবারে স্যুটকেসটি লইয়া টাঙ্গায় উঠাইয়া দিল। হিতৈষী কুলীবন্ধুটির পরামর্শ বরাবর স্মরণ হইতেছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, এ ব্যক্তিও তো ধর্মশালাতেই লইয়া যাইতেছে। আর আমি থাকিবই বা কতক্ষণ। ভালো ব্যবস্থা না হইলেও চলিবে। বরং মন্দিরের কাছে থাকিব, তাহাই ভাল।

তথাকথিত ধর্মশালা

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই ডাহিনে মহাবীর ধর্মশালা ছাড়াইয়া গেলাম—চমৎকার ও পরিষ্কার বাড়ী। ছাড়িয়া যাইবার সময় কার্তিকই উহা দেখাইয়া দিল এবং মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া ধর্মশালা-নামধেয় এক বাড়ির সম্মুখে নামাইল। বাহির হইতে বাড়িটিকে দেখিয়াই বিব্রত বোধ করিলাম, প্রবেশ করিয়া ভীত হইললাম। সমস্ত বাড়িটাই

অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন, খুপড়ী খুপড়ী ঘর, তাহার মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়া একটি খুপড়ী ঘরে নির্দিষ্ট হইল আমার বাসস্থান। অশ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল ; কুলী বন্ধুটির উপদেশ শুনি নাই বলিয়া গ্লানি এবং অনুতাপ হইতে লাগিল। কিন্তু যাহাই হউক, উপায় নাই। স্থির করিলাম কোনরূপে মন্তব্য প্রকাশ করিব না। ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম, বাহিরে কোথাও নড়িবার জায়গা নাই। দরজা খুলিয়া রাখিলে সম্মুখের ঘরে অবস্থিত মহিলাদের অসুবিধা হয়। অগত্যা সেই গরমের মধ্যেই দরজা বন্ধ করিয়া মেঝেতে প্রসারিত একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। যাহার জন্য তাড়াহুড়া করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা হইল না। কার্তিক বলিয়া গেল সেই বৈকালের আগে দর্শন হইবে না। মনে একটা হতাশা বোধ হইল। বৈকালে কখনই জল চড়াইতে দিবে না, এত যত্ন করিয়া হরিদ্বারের জল আনিয়া শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থকাম হইব ?

শুইয়া আছি। দরজাটি ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন একটি ব্রাহ্মণ যুবক, সঙ্গে কার্তিক। পরিচয়ে শুনিলাম পাণ্ডা। ধর্মশালায় আসিয়াছি, এখন ও মন্দিরে যাই নাই। পাণ্ডা কোথা হইতে আমার সন্ধানে আসিলেন ? প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম ধর্মশালা-নামধেয় যে বাড়িটাতে উঠিয়াছি ইহা আসলে পাণ্ডারই বাড়ি। নিম্নতলের একাংশে তাঁহার বাস, উহার বাকী অংশ এবং দ্বিতল যাত্রীদের থাকিবার স্থান। পাণ্ডা মহাশয় ধর্মশালা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এক ভক্তকে দিয়া বাড়ির দ্বিতল নির্মাণ করাইয়া লইয়া উহার নাম দিয়াছেন ধর্মশালা। ইহাতে

তাঁহার উদ্দেশ্য, দাতার উদ্দেশ্য এবং যাত্রীদের উদ্দেশ্য এক সঙ্গে সাধিত হইয়াছে। বুঝিলাম, আমি পাণ্ডার আয়ত্তের মধ্যে। কার্তিকের উপর মনে মনে একটা বিরক্তি আসিল। তাহা চাপিয়া, কিভাবে আচরণ করিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া লইলাম।

পাণ্ডার ৎ

যুবকটি পরিচয় দিলেন তিনি পাণ্ডা নহেন, পাণ্ডার ভ্রাতুষ্পুত্র। দুই তিন পুরুষ পূর্বে তাঁহারা মহারাষ্ট্র হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর রহিয়া গিয়াছেন। পরিচয়দানের পর তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন, বলিলেন—'বাবুজী লোকে তো আজকাল পাণ্ডাদিগকে রাক্ষস বলিয়াই মনে করে, আমরা কত সামান্য লইয়া কত কাজ করিয়া দিই তাহা ভুলিয়া যায়। আশা করি, আপনি সেরূপ লোক নহেন।' পাণ্ডাদের আজকাল কিরূপ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা তিনি বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন। 'জমিজমার খাজনা বাড়িয়াছে, লোকের কাছ হইতেও বেশী কিছু পাওয়া যায় না, যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত রেশনের ব্যবস্থা নাই; যাহা পাওয়া যায় তাহাতে কুলায় না, উপায়ান্তরে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার উপর আবার কংগ্রেস-সরকার হইয়া পাণ্ডাদের আয়ের উপর ইন্‌কামট্যাক্স বসাইতে চাহিতেছে।'

কথাবার্তা হইতেছিল তাঁহার দিক হইতে হিন্দীতে এবং আমার দিক হইতে হিন্দীতে ও বাঙলায়। তাঁহার কথাগুলি

তিনি এমন গড় গড় করিয়া বলিয়া গেলেন যে, শুনিয়াই বুঝিলাম, বাঁধিগৎ। তথাপি তাঁহার কথায় বাঁধুনী ও বলিবার ভঙ্গীর মনে মনে তারিফ করিতেছিলাম এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। পাণ্ডা মহাশয়ের সহিত দুইটি বস্তু ছিল—ফ্রেমে বাঁধানো একটি পট এবং একখানি মোটা জাবদা খাতা। বক্তৃতাটি সমাপ্ত করিয়াই তিনি পটখানি আমার হাতে দিলেন। তাহাতে বিভিন্ন দফায় দান ও অনুষ্ঠানের তালিকা—এক পিঠে নাগরীতে এবং অপর পিঠে ইংরেজীতে ছাপা। আমি ইহার মধ্যে কি কি অনুষ্ঠান ও কয় প্রকার দান করিব জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, অনুষ্ঠানের মধ্যে দর্শন এবং দান করিব কর্মক্ষেত্রে আমার যাহা ইচ্ছা হয়। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, আমার মনে কি আছে জানিবার জন্য ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আরম্ভ হইল একদিকে পীড়াপীড়ি ও চাপ এবং অপরদিকে যথাসাধ্য হাসিমুখে তাহা এড়াইবার চেষ্টা। অবশেষে তিনি নিজেই আমার জন্য একটা দানের তালিকা করিয়া দিলেন যাহাতে ব্যয় মাত্র ৫৫৲। এতক্ষণের আলাপে কেবল তাঁহার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতে-ছিলাম। এইবার দৃঢ় অথচ শান্তভাবে বলিতে হইল—"আজ্ঞে না, ইহা আমি পারিয়া উঠিব না।"

"তবে আপনি কি করিবেন?"

ঝপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—"পাঁচ টাকার মধ্যে কাজ সারিব।"

বস্তুতঃ পাঁচ টাকাও বেশী বলিয়াছিলাম। কেবল দর্শন করিয়া যাইতে এতও লাগিবার কথা নহে।

আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন চমকাইয়া উঠিলেন, কার্তিকের মুখে হতাশা ফুটিয়া উঠিল। কলিকাতায় থাকি, খবরের কাগজে কাজ করি—এ পরিচয়টা পূর্বেই লইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনি মাত্র পাঁচ টাকায় কাজ সারিয়া যাইবেন ইহা হইতেই পারে না ; বেশী করিতে হইবে।"

আবার আরম্ভ হইল পূর্বের ন্যায় পীড়াপীড়ি ও চাপ। ইঁহার কর্মকৌশল দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম : কলিকাতায় থাকি, ইংরাজী জানি, পত্রিকার সম্পাদকতা করি। ইহা সত্ত্বেও যদি আমার উপর এইরূপ চাপ দেওয়া সম্ভব হয়, সাধারণ যাত্রীরা কি সহ্য করে ? পরে দেখিয়াছিলাম এক্ষেত্রে সাধারণ যাত্রীদের সুবিধা আছে, চাপ এড়াইবার উপায়ও আছে, যাহা আমার পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না। দেয় অর্থের পরিমাণ লইয়া তাহারা পাণ্ডার সহিত সরাসরি বিষম বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়া দেয়, পাণ্ডার গলা যতদূর ওঠে তাহার উপরেও গলা চড়ায় এবং আপনাদের সর্তে পাণ্ডাকে বাধ্য করে। প্রকৃতিতে, রুচিতে ও ঔচিত্যবোধে ইহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তীর্থে ক্রোধের প্রশ্রয় দিতে নাই এবং তীর্থগুরুর প্রতি রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিতে নাই। হাজার হৌক, পাণ্ডারা তীর্থগুরু তো বটেই। কথা কাটাকাটি করিতেই মনে মনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম। তথাপি শান্তভাবে ও হাসিমুখে পাণ্ডা মহাশয়ের সহিত ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিলাম।

ধৈর্যের পরীক্ষা

দেখিলাম, সে পরীক্ষায় পাণ্ডা মহাশয় আমার নিকট অপটু। টাকার অঙ্কে উপরে উঠিতে কোনোমতেই আমাকে রাজী করিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রত্যেকবারেই সবিনয়ে বলিতেছিলাম—'রাগ করিবেন না, বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঠিকই বলিয়াছি।' নিজে না পারিয়া অবশেষে তিনি এক কর্মচারীকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে আমার সহিত আলাপের ভার দিলেন। এটিও যুবক, পাণ্ডা মহাশয় অপেক্ষা অল্পবয়স্ক, সুদর্শন ও মিষ্টভাষী; পরিচয়ে জানিলাম, হায়দরাবাদ হইতে আসিয়াছে, সংস্কৃত পড়ে, উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; অত্যন্ত অল্প বেতনে পাণ্ডা মহাশয়ের খাতালেখকের কাজ করিয়া আপনার ব্যয়নির্বাহ করে। সহসা কি মনে হইল, তাহার সহিত সংস্কৃতভাষায় আলাপ আরম্ভ করিলাম; হয়তো ভাবিয়াছিলাম সংস্কৃতভাষণ শুনিয়া পাণ্ডা মহাশয়ের অর্থ আদায়ের ঝোঁক কিছু প্রশমিত হইতে পারে। যুবকের সহিত কথা চলিল অনেকক্ষণ, পাণ্ডা মহাশয় বসিয়া রহিলেন, কিছু বুঝিলেন বলিয়া মনে হইল না। যুবকের নিকট হইতে হায়দ্রাবাদে রাজাকারী-উৎপীড়ন এবং কম্যুনিস্ট-উৎপীড়ন সম্বন্ধে সংবাদ লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, —'ইহার মধ্যে কোনটি বেশী ভয়ঙ্কর?' যুবক বলিল,— 'পূর্বেরটি, কারণ কমুনিস্ট উৎপীড়ন যত প্রবল হউক, শাসন-

ব্যবস্থার চাপে প্রশমিত হইবেই। কিন্তু রাজাকারী উৎপীড়ন? —তদা তু রক্ককা এব ভক্ককা আসন্'।

যুবকটির সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে আসল ব্যাপারের মীমাংসার কোন সুরাহা হইল না। সংস্কৃতভাষণ শুনিয়াও পাণ্ডা মহাশয়ের দাবী কমাইবার প্রবৃত্তি দেখা গেল না। পাণ্ডা মহাশয়ের কর্মচারীর আলাপে খুসী হইলেও আমি সেই ৫৲ টাকাতেই ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডা মহাশয়ই অনেকটা নামিলেন, আমাকে বলিলেন, ১১৲ টাকায় উঠিতে হইবে। দরকার হইলে ১১৲ টাকা দিতে আপত্তি ছিল না (শেষ পর্যন্ত দফায় দফায় যাহা দিতে হইয়াছিল তাহা ১১৲ টাকার উপরেই উঠিল) কিন্তু এক্ষেত্রে পাণ্ডা মহাশয়ের কাছে আমার যতটুকু কাজ তাহাতে ১১৲ টাকা লাগিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, উহা নিছক আদায় করিয়া লওয়া। সেইজন্য পাণ্ডা মহাশয়ের কথায় 'হাঁ' বলিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। এইটুকু বলিলাম—দেওয়ার সময় যদি ইচ্ছা হয় তো দিব। পাণ্ডা মহাশয় রফা করিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ধরিয়া রাখিলেন, অন্ততঃ ১১৲ টাকা পর্যন্ত আদায়ের চেষ্টা করিবেন; আমি মনে মনে বুঝিলাম, ৫৲ টাকায় মিটিবে না। ইহার পরবর্তী কার্য রামেশ্বরতীর্থে তাঁহার পাণ্ডাত্ব স্বীকার করাইয়া জাবদা খাতায় আমার স্বাক্ষর গ্রহণ। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে এখানে পাণ্ডা করিয়া যাইব এমন ধারণা ছিল না তথাপি ইহা ঘটিয়া গেল।

কথা ও কাজ শেষ করিয়া তিনি উঠিতে মনটা যেন হাঁফ

ছাড়িয়া বাঁচিল। সিঁড়ি পর্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া দিলাম। সিঁড়ির পাশের ঘরে একদল যাত্রী ছিল—বাঙালী যাত্রী, একজন আমাকে পাণ্ডা মহাশয়ের অন্তরালে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইল। মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম, ৫৲ টাকা বলিয়া অসঙ্গত কিছু করি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, পূর্বোক্ত যাত্রীরা ৫৲ টাকার মধ্যে ৪।৫ দিন থাকা এবং সকল স্থান দেখাইবার রফা করিয়াছে, অবশ্য পূর্বে যে উপায় বলিয়াছি সেই উপায়ে। যাইবার সময়ে পাণ্ডা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে? জিনিসপত্র আনাইয়া তাঁহার বাড়ীতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমি ইহা একেবারেই কাটাইয়া দিলাম। দেবদর্শন না করিয়া অন্নগ্রহণ করিব না; দেবদর্শনের পরেও যে পাণ্ডাগৃহে আহারে বসিব সে প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কথা মিটিবার পর পাণ্ডা মহাশয় আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, বৈকালে দর্শনের ব্যবস্থা করিবেন—কার্তিক আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। এতক্ষণ বৃথা তর্কের পর এইবার একটা পরম আশ্বাসের কথা পাইলাম—বৈকালেও জল চড়ানো যাইবে—আজ শুক্রবার, বিশেষ অনুষ্ঠান, তাহাতেই এই ব্যবস্থা। জল চড়াইবার জন্য তাম্রপাত্র চাই, পাত্র সঙ্গেই ছিল। পথক্লেশ গিয়াছে যথেষ্ট, আহারও ঘটিল না। তথাপি হরিদ্বার হইতে ধনুষ্কোটি পর্যন্ত দীর্ঘপথবাহিত গঙ্গার জল যে রামেশ্বরের শিরে চড়াইবার উপায় হইল সেই খুসীতেই মন ভরিয়া

মন্দিরে যাইবার উদ্যোগ

বিশ্রাম করিয়া বৈকালের দিকে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভাবিলাম যাইবার আগে স্নান করিয়া যাইব। সম্মুখের ঘরে একটি বাঙালী পরিবার আসিয়াছেন। পরিচয়ে জানিলাম দর্জিপাড়ার বাসিন্দা, আমারই পাড়ার লোক। স্নানস্থানের বর্ণনা তাঁহাদের নিকট শুনিয়া উৎসাহ কমিয়া গেল। তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখি ভাবিয়া গিয়া দেখিলাম স্থানটি একটি নরককুণ্ডবিশেষ। বাড়ির নীচের তলার একাংশে একটা অন্ধকার জায়গা—ভাঙা, খাবলা খাবলা, ভাঙা দরজা, ভাঙা কূপ এবং তাহার কাছে একটি ভাঙা বালতি—মলমূত্রে চারিদিক সমাচ্ছন্ন, আশেপাশে মধ্যে মধ্যে কিছু ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো। স্নান করিব কি সেখানে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব বোধ হইল। সমস্ত দিনের পথক্লেশ, রৌদ্রতাপ ও গ্রীষ্মভোগের পর স্নান করিতে পারিলে শরীর মন স্নিগ্ধ হইত, দেবদর্শনে যাইবার উপযোগী শুচিতাও আসিত। কিন্তু এখানকার অবস্থায় দেখিলাম শুচি হওয়ার পরিবর্তে অশুচি হওয়ার সম্ভাবনাই সম্পূর্ণ। অগত্যা স্নানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কোনরূপে একটু জল সংগ্রহ করিয়া হাত-পা-মুখ ধুইয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি পূর্বসঙ্গী মারাঠী ভদ্রলোকটী পৌঁছিয়াছেন এবং এই ধর্মশালাতেই আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিটা থাকিয়া কাল ক্রিয়াকর্ম করিবেন।

মন্দিরে যাইব বলিয়া রওয়ানা করিয়া কার্তিক আমাকে নীচে পাণ্ডার ঘরে লইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, এইখানে বসিয়াই কাজ সারিয়া লউন, পরে মন্দিরে গিয়া দর্শন করিয়া আসিবেন। এইবার একটু বিরক্তি বোধ হইল, বলিলাম এখানে কাজ করিব কেন? মন্দিরে গিয়া সমস্ত কাজ করাই তো ভালো। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, মন্দিরে গিয়া কাজ করাইবে কে? বলিলাম, আর কাহাকেও না পাই, নিজে যাহা জানি তাহা বলিয়াই দেবতার নিকট নিবেদন করিব। অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। গঙ্গাজল, পুষ্প, নারিকেল ও পূজার অন্যান্য বস্তু লইয়া মন্দিরে চলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি পাণ্ডার বাড়ি হইতে মন্দির সন্নিকটে।

মন্দিরের বিশালতা

মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই উহার বিশালতা অনুভব করিলাম। শ্রীরঙ্গমের মন্দির যেমন পৃথক ভাগে ভাগে গঠিত এখানে তাহা নহে, সমগ্র মন্দিরটাই একটা অখণ্ড সংগঠন—সমগ্রটা মিলিয়া যেন একটা অতিপ্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ। শ্রীরঙ্গমের মন্দির বিস্তারে কিন্তু রামেশ্বরের মন্দির বিশালতায় ও বিপুলতায় মানুষকে অভিভূত করে। তবে প্ল্যানিংএর দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে—বাহিরের সুবিশাল ও সু-উচ্চ আবেষ্টনের আড়ম্বরের মধ্যে মূল-মন্দিরটী অনেক ছোট ও স্বল্পায়তন এবং অভ্যন্তরীণ পথ ও চত্বরের মধ্য দিয়া যেভাবে মূলমন্দিরে পৌঁছিতে হয়—কেহ সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে সহসা

যাইবার উপায় নাই। এইভাবে যাইতে রামেশ্বর-মন্দিরেও স্তর-বিভাগ আছে। কিন্তু তাহা গোটা মন্দিরটার মধ্যেই। মূল-মন্দিরকে ঘিরিয়া চতুষ্পার্শ্বে স্তরে স্তরে বারান্দা, মন্দির প্রবেশের পথে সর্বপ্রথমটিই সর্ববৃহৎ। বারান্দাগুলি পর পর অন্তর্বর্তী এক এক স্তরের বারান্দা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী স্তরের বারান্দায় প্রবেশ করিতে হয়। শ্রীরঙ্গমে যেমন পৃথক পৃথক গোপুরম্ দেখিয়াছিলাম এখানে তাহা নহে—একই মন্দিরের চারদিকে চারিটি গোপুরম্—একটি, সম্ভবতঃ পূর্বদিকেরটি, একেবারে সমুদ্রের উপরেই অবস্থিত। আমি যেটি দিয়া প্রবেশ করিলাম সেটি বোধ হয় পশ্চিম।

মন্দিরটি রামনাদ স্টেটের তত্ত্বাবধানে—মন্দিরের মধ্যে স্টেটের অফিস আছে। তথায় দুইটি টাকা দিয়া জল চড়াইবার অনুমতিপত্র লইতে হইল। ইহা প্রথম স্তরের বারান্দায়। ইহার পর দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য দেবতাদের ও বিশাল বৃষভরাজকে দর্শনের পর উত্তরের এক পার্শ্বে বসিয়া গঙ্গাজলের পূজা ও নিবেদন করা হইল। এই অনুষ্ঠানে গঙ্গার উদ্দেশ্যে কতগুলি মন্ত্র বলা হইয়াছিল, যাহার চলন আমাদের এদিকে নাই। তাহার পর সেই অর্চিত ও নিবেদিত গঙ্গোদক লইয়া মূলমন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শ্রীরঙ্গমের ন্যায় এখানেও দেখিলাম মূলমন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে গর্ভগৃহ অনেকটা দূরে। শ্রীরঙ্গমে গর্ভগৃহের দ্বার পর্যন্ত যাইতে পাইয়াছিলাম। এখানে তাহা হইল না। অপেক্ষা করিতে হইল অনেকক্ষণ। পরে পূজারী আসিয়া জল লইয়া

গেলেন এবং গর্ভগৃহ হইতে আমাকে ডাকিয়া ও দেখাইয়া সেই জল দেবতার শিরে ঢালিয়া দিলেন। গঙ্গার জলে দেবতার অভিষেক নিজে করিব বলিয়া সারাদিন উপবাস করিয়াছিলাম। সে সৌভাগ্য হইল না। তথাপি সেই জলে যে অভিষেক হইল তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া গেলাম। শিবমন্দিরে কোনরূপ প্রবেশ-নিষেধ নাই—থাকা উচিত নহে। আমার ধারণা হইল বৈকাল বলিয়াই দেবমূর্তির নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না। তাহা হইতে পারে। কিন্তু পরে শুনিলাম এ মন্দিরের ইহাই সাধারণ নিয়ম। দর্শনার্থীদিগকে দ্বার ছাড়াইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। দেবতাকে নিবেদনের যাহা কিছু পূজারীর হাত দিয়াই করিতে হয়। সত্য কিনা জানি না ; হইলে, আশ্চর্য বলিতে হইবে।

পার্বতীর মন্দিরে

শিব-মন্দিরে দূর হইতে দর্শনের দুঃখ পার্বতীর মন্দিরে গিয়া ঘুচিল। দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্মনিবেদন জানাইলাম। পূজারী মালা প্রসাদ করিলেন। ফিরিবার সময় পূজারীরা ধরিলেন, সন্তুষ্ট করিয়া যাইতে হইবে। পূজারীরা ১২ ঘর। এখানকার নিয়ম এই যে পূজারীদের দিতে হইলে এমন কিছু দিতে হইবে, যাহা ১২ জনে ভাগ করিয়া লইতে পারে। দর্শনে পর চত্বরের এক পার্শ্বে আনিয়া যাত্রীকে বসাইয়া পূজারীরা সারি বাঁধিয়া সম্মুখে বসিয়া যায় এবং দক্ষিণা চাহে। সকলেই যে ১২ জনের প্রাপ্য হিসাব করিয়া দিয়া থাকে তাহা নহে। পথের সঙ্গী মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি সস্ত্রীক আসিয়া-

ছিলেন। তিনি পূজারীদের অনেক প্রার্থনা সত্ত্বেও এক টাকার বেশী দিলেন না। কিন্তু আমি এড়াইতে পারিলাম না। পূজারীদের কোনো পীড়াপীড়ি নাই। তাঁহারা বলিলেন—আপনি এতদূর হইতে আসিয়াছেন। আমরা একবারই পাইব। আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া যান। তাঁহারা যাহা চাহিলেন তাহাই দিয়া নমস্কার করিয়া উঠিলাম। পূজারীরা বলিয়া দিলেন, 'আজ শুক্রবার, রাত্রি ৮টায় পার্বতী সোনার পালকীতে মন্দির দর্শনে বাহির হইবেন। ইহা সমারোহের ব্যাপার। দেখিতে আসিবেন।' বস্তুতঃ ফিরিবার সময়েই দেখিলাম পার্বতীর ভোগমূর্তি ভ্রমণের জন্য সজ্জিত হইতেছেন। মূলমন্দির হইতে বাহির হইয়া একেবারে সর্বপ্রথম বারান্দায় চলিয়া আসিলাম এবং সেই পথে মন্দির প্রদক্ষিণ সুরু করিলাম—পিছু পিছু একদল প্রার্থী। পূজারীদিগকে সন্তুষ্ট করার পর হইতেই ইহারা পিছু লইয়াছিল। অনেককেই কিছু কিছু দিয়াছিলাম, কিন্তু কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না—সকলকে দিতেও পারিলাম না। প্রদক্ষিণের পর কার্তিককে সহায় করিয়া মন্দির ছাড়িয়া সোজা পাণ্ডার ধর্মশালার কামরায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডার লোক আসিল পাওনা বুঝিয়া লইতে। বলিলাম, ঠাকুরের চরণামৃত এখনও আসে নাই। অনুগ্রহ করিয়া তাহা আনিয়া দিয়া প্রাপ্য লইয়া যাইবেন। তিনি রাজী হইলেন না, জিদ করিতে লাগিলেন। সুতরাং দাবী মিটাইতে হইল। আর একবার আরম্ভ হইল দফাওয়ারী দাবী। তাহাতে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডা মহাশয়ের কথাই রহিল,

প্রায় এগার টাকাই উঠিল। ইহার পর যিনি চরণামৃত লইয়া আসিলেন তাঁহাকেও কিছু দিতে হইল। কিন্তু যাহাকে কিছু দিবার ইচ্ছা আমার মনে মনে ছিল, তাহাকে দেওয়া হইল না; সেও বোধ হয় ইহাদের সম্মুখে চাহিতে সঙ্কুচিত হইল। দাবীদাওয়া মিটিলে কার্তিক বিদায় লইল, বলিয়া গেল রাত্রি ৮টায় আসিয়া মন্দিরে পার্বতীর যাত্রা দেখাইতে লইয়া যাইবে, তাহার পর রাত্রি সাড়ে ৯৷৷৹টা ১০ টায় স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে।

সারাদিন অনাহারের পর তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিলাম। চাহিতে জল আসিল, তাহার অতিরিক্ত একটু চাহিলাম। —সামান্য চিনি। 'আনি' বলিয়া পাণ্ডার লোক চলিয়া গেল, সে আর ফিরিল না। অগত্যা জলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইয়া পুনরায় মন্দিরে যাইবার জন্য কার্তিকের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি ৮টা বাজিয়া যায়, তথাপি কার্তিক ফিরিল না। দেখিলাম অন্যান্য যাত্রীয়া মন্দিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। মন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। পাণ্ডার অপর এক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কার্তিক কোথায়?' 'কার্তিক' নাম শুনিয়া সে হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখনই অবস্থাটা সমঝিয়া বলিলাম 'আর্মুখ'; বলিতেই সে বুঝিল এবং বলিল 'আর্মুখ' অন্য যাত্রী আনিতে স্টেশনে গিয়াছে। স্টেশনে গিয়াছে, সুতরাং তাহার অপেক্ষায় থাকা বৃথা। অন্য যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়াই মন্দিরে চলিলাম। একটা ভয় হইতেছিল—মন্দিরের অভ্যন্তরে জটিল যাতায়াত পথে নিশানা হারাইয়া না ফেলি।

পার্বতীর যাত্রা

রামেশ্বর মন্দিরে এই পার্বতীর যাত্রা একটি বিশেষ দেখিবার বস্তু। শুক্রবার, শুক্রবার এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা পার্বতীদেবীর সাপ্তাহিক মন্দির পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধান; বিশাল পরিবারের গৃহিণী যেমন সর্বদা সকল খোঁজ লইতে পারেন না, নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত গৃহপরিবারের খোঁজ খবর লইয়া থাকেন, সেইরূপ। এই তত্ত্বাবধানের জন্য রাত্রের আরতির পর দেবী সুবর্ণশিবিকায় চাপিয়া বাহির হন। বর্তমান শিবিকাটি রামনাদের রাজা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন বৎসর দশেক পূর্বে। তখন ব্যয় পড়িয়াছিল দেড় লক্ষ টাকার উপর। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথম বারান্দা হইতে দ্বিতীয় স্তরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; দেখি দ্বিতীয় বারান্দায় প্রবেশ পথের মুখেই শিবিকাটি বসানো রহিয়াছে—কাষ্ঠের শিবিকা আগাগোড়া সোনায় মোড়া, ঝকঝক করিতেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইবার পর সমারোহ-সহকারে পার্বতী* আসিয়া শিবিকায় উঠিলেন। সঙ্গে বহু লোকজন। দুই পার্শ্বে মশাল। মশালবাহীর বাম হস্তে ধাতুদণ্ডের শীর্ষে মশাল জ্বলিতেছে, দক্ষিণ হস্তে স-নল তৈলভাণ্ড। মধ্যে মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তৈলনিষেক করিয়া উহা জীয়াইয়া রাখিতেছে। এখানে যথারীতি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবার পর দেবীর শিবিকা প্রথম বারান্দায় বাহির হইল। তথায় জৌলুস পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা আগে চলিল। জৌলুস

* অর্থাৎ দেবীর ভোগমূর্তি

সহ দেবীর শিবিকা যেদিকে অগ্রসর হইল সেদিকে জনতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না গিয়া আমি অপর দিকে ঘুরিলাম এবং যথাসম্ভব দ্রুত চলিয়া মন্দিরে প্রবেশের মূলপথের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—দেবীর জৌলুস যে দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে উহাও এই পথ দিয়াই যাইবে। অল্প কালের মধ্যেই উহা ঘুরিয়া আসিল ; আমিও এখানে দাঁড়াইয়া দেখিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইলাম।

প্রথমেই চলিয়াছে ঘোড়সওয়ার কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া ; তাহার পর আসিল এক বিশালকায় হাতী ; মন্দিরের মধ্যে হাতী চলিতে দেখিব ভাবি নাই, ইহাতে যেমন অশ্চর্য বোধ হইল তেমনি গঠনের বিশালতা যেন আরও স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হইল। হাতীর পর অন্যান্য বাহন এবং তাহার পর আসিলেন শ্রীগণপতি —দশভুজমূর্তি, সিংহে আরূঢ় গণেশের এই মূর্তি ইতিপূর্বে দেখি নাই। শ্রীরঙ্গমের গণেশমূর্তির ন্যায় ইঁহার বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখিতে পারি ভুবনেশ্বরেও কতকগুলি বিশিষ্ট আকারের ও ভঙ্গীর গণেশমূর্তি দেখিয়াছি। দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর ভবনে একটি বিশেষ গণেশমূর্তি আছে,—নেপাল হইতে প্রাপ্ত—দশভুজ, ইন্দুর-বাহনের উপর দণ্ডায়মান। গণেশের পশ্চাতে আসিল পার্বতীর শিবিকা। পার্বতীর শিবিকা মূল প্রবেশপথের মুখে আসিয়া থামিল। তখন একটু নাটকীয় ব্যাপার দেখিলাম। এই স্থানে উর্ধ্ব হইতে দুইটি অপ্সরামূর্তি ঝুলিতেছিল। পার্বতীর শিবিকা আসিতেই তৎসংলগ্ন সূত্র কেহ টানিল এবং অপ্সরাদের হাতে

ফুলের সাজি হইতে দেবীর উপর পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দেবীর শিবিকা চলিয়া গেল। আমিও পাণ্ডাভবনে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে শঙ্খের মূল্য অত্যন্ত সুলভ। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময়ে গোপুরমে দাঁড়াইয়া একটি বালক ছয় আনায় দুইটি শঙ্খ লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়পীড়ি করিয়াছিল। ফিরিবার সময়ে দেখিলাম সে তখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পীড়াপীড়িতে শঙ্খ দুইটি লইবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু আমার বোঝা ক্রমশঃ ভারী হইয়া উঠিতেছে আর একা বাহক ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। আর বোঝা লইতে সাহস হইল না।

রামেশ্বর হইতে যাত্রা

পাণ্ডাভবনে আসিয়া দেখিলাম কার্তিক তখনও ফেরে নাই। রাত্রি অধিক হইয়া উঠিতেছে। উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু স্টেশনে যাইবার সঙ্গী মিলিল না। অন্ধকার রাত্রি আলোকহীন। একাকী বাহির হইয়া পড়িতে ইতস্ততঃ বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ বাসার কাছাকাছি টাঙ্গা পাইবার উপায় নাই, চেষ্টা করিলে গোযান মিলিতে পারে। আমার ট্রেণের যা সময় তাহাতে গরুর গাড়ি লইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু এতখানি পথ! একাকী অনেকক্ষণ গোযানে থাকিতে হইবে! এইরূপ উৎকণ্ঠার মধ্যে কার্তিক আসিল এবং টাঙ্গাও সংগ্রহ করিয়া আনিল। স্টেশনে পৌঁছাইয়া, বিশ্রামকক্ষে বসাইয়া দিয়া সে বিদায় চাহিল। তাহাকে বিদায় দিতে মনের মধ্যে কোথাও একটা বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিছু দিতে চাহিলাম।

যাহা দিলাম সে তাহা অপেক্ষাও বেশী আশা করিয়াছিল, ইহা জানাইল। তাহার আশা করাটা অসংগত হয় নাই। আরও দিতে পারিলে আমার মনও প্রসন্ন হইত। কিন্তু উপায় ছিল না। দিবার মতো অর্থ তখন ফুরাইয়া আসিয়াছে। ভ্রমণের এখনও অনেকটা বাকী। তাহাকে বুঝাইলাম, তথাপি সে হয়তো মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াই বিদায় লইল।

বিশ্রামকক্ষে আমি একা। রাত্রি হইয়াছে তবু এখনও অনেকক্ষণ থাকিতে হইবে, কারণ গাড়ি রাত্রি ৩টায়। তবে সুবিধা এই, গাড়ি রামেশ্বর হইতেই ছাড়ে। কার্তিককে বিদায় দিয়া ভাবিলাম একটু ঘুমাইয়া লইব। স্টেশনমাস্টার মহাশয় ভরসাও দিয়াছিলেন যে গাড়ি প্লাটফরমে আসিলে আমাকে জাগাইয়া দিবেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ঘুম হইল না। কিছুক্ষণ পরেই একটি যাত্রী—মনে হইল সরকারী কর্মচারী—দলবল লইয়া আসিয়া এমন সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, ঘুমাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নিদ্রাহীন ক্লান্ত মনে একাকিত্বের অনুভূতি প্রবল হইয়া দেখা দিল; সন্তানের কল্যাণ চিন্তায় সদা-উৎকণ্ঠিতা জননীর কথা ভাবিয়া মন উতলা হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল এখান হইতেই ছুটিয়া চলিয়া যাই। কাদ্দালুর ও ত্রিচিনপল্লীর কথা ভাবিলাম। মাদুরার দেবী মীনাক্ষী এবং কন্যাকুমারীর চিন্তায় মনকে অনেকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। ক্রমশঃ মন আবার শান্ত ও স্থির হইয়া আসিল। অর্ধ ঘুম ও অর্ধ জাগরণের অবস্থায় ইজিচেয়ারে পড়িয়া রহিলাম। লোকের কলরবে যখন

জড়তা ভাঙ্গিল, তখন দেখি গাড়ি প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গাড়িতে উঠিবার জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমাকেও সেই তাড়া-হুড়ায় যোগ দিতে হইল, কিন্তু স্যুটকেসটি তীর্থের সঞ্চয়ে এমন ভারী হইয়া উঠিয়াছে যে, বহন করা কষ্টসাধ্য অথচ সেটিকে গাড়িতে তুলিয়া দিবে এমন কুলী পওয়া গেল না। অগত্যা আপনিই সেটিকে লইয়া কোনপ্রকারে দেহটাকে টানিয়া গড়িতে উঠিবার স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক একটি সহৃদয় রেল-কর্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সহায়তায় অগ্রসর হইলেন, নিজেই কামরা খুঁজিয়া আমাকে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সে অনু-গ্রহটুকু স্মরণে রাখিয়াছি। যে কামরায় উঠিলাম, তাহাতে স্বচ্ছন্দে শুইবার জায়গা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। গাড়ি রামেশ্বর ছাড়িল।

(৭)

মাছুরা

রামেশ্বর হইতে চলিয়াছি। যাইব কন্যাকুমারী। কিন্তু যাইতে হইতেছে ত্রিবান্দ্রম হইয়া। পথে মাছুরা। কেহ যদি মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখে তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হইবে যে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হইতেছে। রামেশ্বর পূর্ব প্রান্তে, ত্রিবান্দ্রম পশ্চিম প্রান্তে এবং কন্যাকুমারী দক্ষিণ প্রান্তে। ত্রিবান্দ্রম হইয়া কন্যাকুমারী যাওয়ার অর্থ পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখী হওয়া। ব্যবস্থাটা এমন কেন হইল অনেকবার ভাবিয়াছি। বরাবর পূর্ব সীমান্ত দিয়াই দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছিবার ব্যবস্থা থাকিলে রামেশ্বর হইতে কন্যা-কুমারী পৌঁছিবার পথ ও সময় অনেক সংক্ষেপ হইত। এ ব্যবস্থাটা হওয়া দরকার। ইহা করা তুঃসাধ্য বলিয়াও মনে হয় না। পূর্ব প্রান্তে রামেশ্বর হইতে আরও দক্ষিণে অবস্থিত তুতিকোরিণ পর্যন্ত মাদ্রাজ হইতে গাড়ি যাতায়াত করে। শুনিলাম তুতিকোরিণ হইতে একটি শাখা লাইন আরও খানিকটা দক্ষিণে তিরুচেন্দুর পর্যন্ত গিয়াছে। তিরুচেন্দুর হইতে এই লাইনটিকে যদি কন্যাকুমারী পর্যন্ত টানিয়া লওয়া যায় অথবা তাহা পুরাপুরি সম্ভব না হইলে, যতটা সম্ভব রেল এবং বাকীটা মোটর 'বাসের' ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাত্রীদের সময় ও পথক্লেশ অনেক বাঁচে। রামেশ্বরে আসিবার পথে মনমাছুরা জংশন দিয়াও বোধহয় কন্যাকুমারী

যাইবার রেলপথ হইতে পারে। ত্রিবান্দ্রম হইয়া কন্যাকুমারী যাইতে রেলপথ ত্রিবান্দ্রম পর্যন্তই শেষ। তাহার পর দীর্ঘ পথ মোটর 'বাসে' অতিক্রম করিয়া কন্যাকুমারী পৌঁছিতে হয়। বৃদ্ধাচলমের যুবক বন্ধুরা বলিয়া দিয়াছিল মধ্যপথে তিনেভেলীতে নামিয়াও কন্যাকুমারী যাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে পথ সংক্ষেপ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ যাত্রীরা সে পথে যায় না। তিনে-ভেলীতে নামিয়াও বাকী পথ যাইতে হয় মোটর 'বাসে'। কিন্তু এখানে 'বাস' পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই। ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নিয়মত ভাবেই 'বাস' চলাচল করিয়া থাকে।

মাতুরায় চলিয়াছি।

ট্রেণে ভোর হইল। জাগিয়া উপলব্ধি করিলাম শরীরে অসাধারণ ক্লান্তি। মনে হইল নড়িবার সামর্থ্য পর্যন্ত নাই। ভয় হইল ভ্রমণের বাকী অংশ সম্পূর্ণ করিব কেমন করিয়া? ক্রমা-গতই তো চলিতেছি—বিশ্রাম নাই; আহার, বাস কিছুরই নিশ্চয়তা নাই। রাত্রি কাটিতেছে হয় রেলের কামরায় নয় স্টেশনের প্লাটফরমে। এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে? চিন্তা হইল বটে, কিন্তু দেখিলাম চিন্তা করিয়াও লাভ নাই। বিধাতার চক্রে ঘুরিতেছি। ইহা সম্পূর্ণ না করিয়া বিশ্রাম পাইব না। অতএব শরীরটাকে কোনমতে টানিয়া তুলিয়া প্রাত্যহিক কার্যে মন দিলাম এবং প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠেয়সমূহ সমাপ্ত করিয়া বসিলাম। দক্ষিণের প্রকৃতির যেরূপ দৃশ্য কয়দিন ধরিয়া দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি তাহাই দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। একজন সহযাত্রী জুটিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত

মধ্যে মধ্যে আলাপ করিতে লাগিলাম। পথে এক হকার বালক সংবাদপত্র লইয়া উঠিল, তিনি কিনিলেন; পত্রিকাটি তামিল, নাম টেলিগ্রাফ, অবশ্য তামিল শব্দে। সংবাদপত্রের আবির্ভাবে একটু বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইল, মনে হইল যেন বহুদিন পর সংবাদপত্রের সক্ষাৎ পাইলাম। সহযাত্রীটি পড়িলেন, খবর কিছু কিছু শোনাইলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহার সঙ্গ লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। তিনি পথে নামিয়া গেলেন। অবার একাকী হইলাম।

রাও

চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম মাদুরায় পৌছিয়া উঠিব কোথায়? ত্রিচী হইতে শ্রীযুত রাওকে পত্র দিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার তো কোন উত্তর পাই নাই, উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করিতে পারি নাই। তিনি যে মাদুরায় আছেন বা আমার পত্র পাইয়াছেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? নিজের মনের মধ্যে সন্ধান করিয়া দেখিলাম, এখানেও সেই এক ভরসা—"যোগক্ষেং বহাম্যহম্"। ট্রেণ মাদুরায় পৌঁছিল। যথারীতি স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সন্ধান লইবার জন্য ওভারব্রিজে উঠিতেছি। সহসা চলমান জনস্রোতের মধ্য হইতে প্রিয়দর্শন এক যুবক বাধা দিয়া জিজ্ঞসা করিল—"আপনি কি ভট্টাচার্য?"

অপ্রত্যাশিত অথচ একান্ত আকাঙ্খিত এই সাক্ষাতে আনন্দের আবেগে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিলাম—"আর আপনি রাও"

হাসির বিনিময়ে পরিচয় হইয়া গেলে।

প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইয়াছিলাম। রাও বলিলেন—"গাড়িটা আজ ১৫ মিনিট আগেই আসিয়াছে। কি রকম মনে হইল—একটু আগেই স্টেশনে আসিলাম। দেখিতেছি ঠিক সময়ে আসিলে আপনার সহিত দেখা হইত না।" ঘটনাচক্র বটে! তথাপি শুনিয়া বিস্ময় অনুভব না করিয়া পারিলাম না। স্টেশনের সন্নিকটে রাও-এর অফিস এবং অফিস গৃহের সংলগ্ন তাঁহার বাসা। বাসায় পৌঁছিয়া প্রথমেই স্নানের উদ্যোগ করিলাম এবং স্নান করিয়া যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম। কলিকাতায় থাকিয়াও নিত্য অবগাহন স্নানের অভ্যাস। এ কয়দিনের ক্লেশ যেন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল—যথা কাবেরী তথা সেতুবন্ধনের সমুদ্র এবং তথা রামেশ্বর। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন—"সিন্ধু সমীপে যদি কণ্ঠ শুখায়ব"। ইহা এমন আশ্চর্য নহে, গলা শুখাইয়া কাঠ হইয়া গেলেও সিন্ধুর লবণ-জল কোনমতেই কাহারও গলা দিয়া গলিবে না। কিন্তু সিন্ধু-সমীপে আসিয়াও যে স্নানের ক্লেশ হইতে পারে তাহা এই দেখিয়া আসিলাম। স্নানটা জীবনধর্মের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য এবং শরীরের ও মনের প্রসন্নতার পক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাহা রাওয়ের বাসায় স্নানে স্নিগ্ধ হইয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলাম।

রাওয়ের বাসার মধ্যে স্বল্পপরিসর প্রাঙ্গণটিতে একটি তুলসীমঞ্চ এবং নানাপ্রকার ফুলের গাছ। এগুলি তাঁহার জননীর পূজার উপকরণ। ফুলের নামগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বাঙলা নামের সহিত সাদৃশ্যে আশ্চর্য

হইয়া গেলাম। রাও ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্রী, কিন্তু দুই তিন পুরুষ তামিলরাজ্যে থাকিয়া তামিল হইয়া গিয়াছেন। যতদূর বুঝিলাম, দেবপূজার ব্যবস্থা করিবার জন্যই ইঁহাদিগকে আনানো লইয়াছিল। এখনও ইঁহার আত্মীয়স্বজনেরা মন্দিরের পূজার অধ্যক্ষ—মাদুরায় এবং রামেশ্বরে। ত্রিচিনপল্লী হইতে আমার পত্র পাইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি মাদুরা হইয়া রামেশ্বর যাইব এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামেশ্বরে কাজ শেষ করিয়াই আসিয়াছি। মাদুরা দর্শন বাকী। স্নানাদির পর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে রওয়ানা হইলেন। রাও সঙ্গে থাকায় মন্দিরের দর্শনাদির বেশ সুবিধা হইয়াছিল।

মন্দিরে রওয়ানা হইবার সময় রাও আমার পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন—"আপনার পোষাক দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। দেখিতেছি আপনাদের দেবমন্দিরে যাইবার পরিচ্ছদও আমাদেরই মতই।" আমি বলিলাম—"তা হইবে না কেন? দেবকার্যের বিধি ত ভারতের সর্বত্রই প্রায় সাধারণ।" আমার পরিধানে ছিল গরদের ধুতি ত্রিকচ্ছ করিয়া পরা, গলায় গরদের চাদর; যাইতেছিলাম নগ্ন পদে। কোঁচা, কাছা ও কোঁচার নিম্নাংশ ভাঁজ করিয়া উঠাইয়া দিলে হয় ত্রিকচ্ছ। ইহার সহিত দুই পাশের দুইটি কসি লইয়া পঞ্চকচ্ছও ধরা হইয়া থাকে। দেবকার্যে ত্রিকচ্ছ হইতে হইবে। দেবদর্শনের বিশেষ রীতি উত্তরীয় না লইয়া যাইতে নাই। বাঙলাদেশে ইহা শিথিল। কিন্তু এখানে ইহা আবশ্যকরণীয়।

মন্দিরের বৈশিষ্ট্য

শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখিয়াছি; রামেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছি; মাদুরায়ও দেখিলাম। শ্রীরঙ্গমে বিস্তার, রামেশ্বরে বিশালতা, মাদুরায় বিস্তার ও বিশালতা দুই-ই। তবে এই দুই বৈশিষ্ট্যেই মাদুরার মন্দিরের পদ্ধতি শ্রীরঙ্গম ও রামেশ্বর হইতে পৃথক। ইহাতে বিস্তার থাকিলেও শ্রীরঙ্গম মন্দিরের মত স্তরভেদে বিন্যস্ত নহে—চারিদিকে চারিটি গোপুরমের মধ্যে সমগ্রভাবে গঠিত একটা মন্দিরের মধ্যেই সমস্ত বিন্যস্ত; এইদিক দিয়া রামেশ্বর মন্দিরের সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রামেশ্বর মন্দিরের মত বিশালতা থাকিলেও ইহাকে অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ বলিয়া মনে হয় না—মন্দিরের মধ্যে স্তম্ভ, অলিন্দ ও চত্বরের চমৎকার বিভাগ। তাহার উপর মাদুরার নিজস্ব বিশেষত্ব মন্দিরের কারুকার্যে, প্রাচীরচিত্রে, প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্রের ভাস্কর্যে এবং নানা প্রকার দেবমূর্তির গঠনে। দক্ষিণের মন্দিরের যাহা সাধারণ বিশেষত্ব তাহা এ মন্দিরেও বর্তমান। চতুর্দিককার সুউচ্চ গঠন ও বেষ্টনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক স্বল্পায়তন মূলমন্দির। বস্তুতঃ কোথাও মূলমন্দিরটি সহজে চোখে পড়ে না। চতুর্দিককার গঠনের নৈপুণ্য ও বিশালতাই দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়া রাখে। দক্ষিণের এই মন্দির দেখিতে দেখিতে যাহা বারবার মনে হইয়াছে মাদুরায় আসিয়া তাহা আরও দৃঢ় হইল। মন্দিরগুলি দুর্গের পরিকল্পনায় বিন্যস্ত ও গঠিত। মনে হয় উত্তর ভারতের অভিজ্ঞতা হইতে দক্ষিণের মন্দির স্থাপয়িতারা শিক্ষালাভ করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। আক্রমণ হইলে প্রবেশ করা এবং সহসা পথ চিনিয়া মূলমন্দিরে উপস্থিত হওয়া সহজসাধ্য নহে। বিশাল ও সুদৃঢ় গোপুরগুলি রুদ্ধ করিয়া দিয়া ইহারা অন্ততঃ কিছুকাল দুর্গের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে পারে—বহু লোককে আশ্রয়ও দিতে পারে। সন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম, এরূপ ঘটনা বস্তুতঃই ঘটিয়াছে। নগর আক্রান্ত হইলে পুরবাসীরা মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। উত্তর ভারতের মন্দির যেরূপ বার বার আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে দক্ষিণে যে সেরূপ ঘটে নাই—ইহা এক পরম সৌভাগ্য। তাহা হইলে প্রাচীনত্বের যেটুকু আমাদের অবশিষ্ট আছে তাহাও থাকিত না।

মন্দিরের কারুকার্যের কথা বলিয়াছি। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ না করিলে মাদুরার মন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও অসম্পূর্ণ থাকে। প্রবেশপথের পার্শ্ববর্তী প্রাচীরে অঙ্কিত বিচিত্র চিত্রসমূহের সারিতে শিবলীলার বর্ণনা—শুনিলাম ইহাতে যতগুলি লীলার বর্ণনা আছে তাহার সংখ্যা ৯৫। কতকাল পূর্বের অঙ্কিত এই চিত্রগুলি এখনও ম্লান হয় নাই। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কিন্তু চিত্র অপেক্ষাও প্রধান এবং আকর্ষণীয় মনে হইল মূলমন্দিরের চারিপাশে বিভিন্ন কক্ষে প্রতিষ্ঠিত এবং স্তম্ভের গাত্রে খোদিত নানাপ্রকার দেব ও দেবীর মূর্তি। যাহাদের নাম শুনি নাই, যাহাদের নাম শুনিয়াছি বর্ণনা কোথাও পাই নাই এবং যাহাদের বর্ণনা পাইয়াছি কিন্তু মূর্তি কোথাও দেখি নাই—এমন সব দেবদেবীর মূর্তি এবং তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব ভঙ্গী বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

নটরাজ শিবের দক্ষিণে প্রচলিত এক মূর্তির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। কিন্তু এখানে তাঁহারও দেখিলাম বিভিন্ন ও বিচিত্র মূর্তি। নটরাজ বীরভদ্র, দশভুজ নটরাজ, অগ্নিবীরভদ্র রুদ্রবীরভদ্র, কালী ও শিবের নৃত্য-প্রতিযোগিতা, কালী ও শিবের উধ্বর্তাণ্ডব প্রভৃতি অপূর্ব দর্শনীয় মূর্তি। এই উধ্বর্তাণ্ডব মূর্তি সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রলয়ের নৃত্যে কালীকে পরাজিত করিতে না পারিয়া শিব অবশেষে উধ্বর্তাণ্ডব আরম্ভ করেন। উধ্বর্তাণ্ডবের পণ হইল উত্তোলিত দক্ষিণ পদ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ হইতে আভরণ খসাইয়া পুনরায় কর্ণে পরাইতে হইবে। শিব সহজেই ইহা করিলেন কিন্তু নারীসুলভ সঙ্কোচবশতঃ কালী এই ভঙ্গী অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরাজয় ঘটিল। মূর্তিগুলির মধ্যে যেগুলি কক্ষে প্রতিষ্ঠিত সেগুলি এক প্রকার অক্ষত আছে। কিন্তু যেগুলি লোকের যাওয়াআসার পথের মধ্যে স্থাপিত সেগুলি বিকৃত ও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া গভীর দুঃখ বোধ হইল। একটি বৃহৎ কালীমূর্তি মাখমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। শুনিলাম মারীভয় দেখা দিলে স্থানীয় নারীরা মাকে শান্ত করিবার জন্য মাখম খাওয়াইতে আসে এবং তাল তাল মাখম প্রতিমার গায়ে ছুড়িয়া দেয় সেইগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া সমস্ত মূর্তির উপর একটা আবরণ জমিয়া গিয়াছে। পুরাণে, তন্ত্রে ও শিল্পশাস্ত্রে যে সকল মূর্তির উল্লেখ বা বর্ণনামাত্র পাওয়া যায় এই সকল মূর্তি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেবল ধর্মের দিক হইতে নহে। শিল্পসাধনার দিক হইতে, প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে এবং সংস্কৃতির দিক হইতে

এগুলি অমূল্য। এইগুলি লোপ পাইলে পুনরায় মূর্তিগুলির আকৃতি কল্পনা করিয়া লওয়াও দুঃসাধ্য হইবে। আমার দেখা—অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে দ্রুত পরিদর্শন। যথেষ্ট সময় দিয়া যত্নের সহিত দেখিলে মূর্তিগুলির সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও দেবতা

মন্দিরটি শুনিলাম খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র বৎসরের। দেবতার প্রতিষ্ঠার সময় হয়তো ইহাই। কিন্তু মন্দিরটি দেখিলেই বোঝা যায়, সমগ্র মন্দির এতদিনের নহে, সমগ্র মন্দির এক সঙ্গে তৈয়ারীও নহে! মন্দিরটি ভাগে ভাগে নির্মিত ও প্রসারিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বর্তমান আকার পাইয়াছে। এ আকার কয়েক শতাব্দী পূর্বের। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে সকল চিত্রের কথা বলিয়াছি তাহাতে একটি যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে। যুদ্ধে এক পক্ষের সৈন্যকে দেওয়া হইয়াছে মুসলমানী আকৃতি ও পোষাক। এই একটী দৃষ্টান্ত হইতেই প্রমাণ হয় মন্দিরের গঠনে ও অলঙ্কারে আধুনিকতার স্পর্শ আছে। মন্দির সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে পূর্বে ছিল নিবিড় কদম্ববন। সেই কদম্ববনে ছিল দেবীর অধিষ্ঠান। পরে দেবীর নির্দ্দেশ পাইয়া স্থানীয় নরপতি তাঁহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের সেই মূল অবস্থার নিদর্শনরূপে সেকালের দুইটি কদম্ববৃক্ষের শুষ্ক কাণ্ড মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত। দেখিলে মনে হয়, তাহার বৃক্ষত্ব বা কাষ্ঠত্ব কিছু আর অবশিষ্ট নাই—

একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে। কদম্ববনে দেবীর অধিষ্ঠান—এ কাহিনীর প্রমাণ আছে; পুরাণের আখ্যায়িকায় ও স্তোত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে এবং মহিষমর্দিনী স্তোত্রে দেবীকে "কদম্ববনপ্রিয়া" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মীনাক্ষী। দুইটি মূলমন্দিরের মধ্যে প্রধানটি তাঁহার আর অপরটি তাঁহার ভৈরবরূপে অবস্থিত "সুন্দরেশ" আখ্যাযুক্ত শিবের। মাদ্রাজী নামের মধ্যে সুন্দরেশ নাম শুনিয়াছি। নামটি এখান হইতেই গৃহীত হয়। নামটি শুনিয়া মনে হইয়াছিল উচ্চারণে ভুল আছে—উহা "সুন্দরীশ" হইবে। দশমহাবিদ্যার মধ্যে তৃতীয় বিদ্যা, যাঁহাকে বাঙলা দেশে প্রচলিত ব্যবহারে আমরা ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী বলি, তাঁহারই উপাসনা দক্ষিণ ভারতে বহুপ্রচলিত। এই দেবতার অন্যান্য নামগুলির মধ্যে আছে "সুন্দরী", "শ্রী" "অরুণা" প্রভৃতি। ভাবিয়াছিলাম অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তৃতীয়া বিদ্যাই হইবেন এবং তাঁহারই নাম অনুসারে "সুন্দরীশ" হইবে ভৈরবের নাম। যদি ইঁহারা দেবীর নাম "সুন্দরী" না লইয়া "সুন্দরা" করিয়া থাকেন তবে ভৈরবের নাম 'সুন্দরেশও' হইতে পারে। ঈশ্বরী এবং ঈশ্বরা দুইটি নামেই দেবী পরিচিতা। দেবী তৃতীয়া বিদ্যা হইবেন, আর একটি কারণে তাহা অনুমান করিয়াছিলাম। বাহিরের চত্বর অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরের চত্বরে প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই অঙ্কিত রহিয়াছে শ্রীচক্র। ইহা তৃতীয়া বিদ্যারই প্রতীক। বৈদ্যনাথধামের মোহান্ত ও পাণ্ডারা শ্রীবিদ্যার

উপাসক। তথাকার বৈদ্যনাথ-মন্দির সংলগ্ন মোহান্তের ভবনে শ্রীচক্র অর্চিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় কালীঘাটে হিন্দুমিশনের গৃহসংলগ্ন ত্রিকোণেশ্বরের মন্দিরে স্থাপিত শিবের গৌরীপট্টের উপর শ্রীচক্র খোদিত আছে। কৌতূহলীরা দেখিয়া লইতে পারেন। শ্রীচক্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে, শাস্ত্রে বলে, শ্রীচক্র দর্শনেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। কিন্তু মীনাক্ষী মন্দিরের প্রবেশদ্বারে শ্রীচক্রটি যেভাবে খোদিত তাহার উপর দিয়াই লোকে যাওয়া আসা করিতেছে দেখিয়া অন্তরে গভীর আঘাত লাগিল। পথের সঙ্গে মিশাইয়া খোদিত না করিয়া একটু উঁচু করিয়া বসাইলেই ইহা পরিহার করা যাইত। এখনও ইচ্ছা করিলে ইহার উপর দিয়া না গিয়া পাশ দিয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং যাওয়া নিবারণ করাও যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকে অত বোঝে না এবং মন্দিরের কর্তৃপক্ষের দিক হইতেও লোককে এ বিষয়ে সতর্ক করিবার কোনো প্রয়াস নাই।

মূলমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেবী তৃতীয়া বিদ্যা নহেন, মাতঙ্গী, দশমহাবিদ্যার তালিকায় নবমে যাহার নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পূজারীদের সহিত আলাপ করিতে পারিয়াছিলাম কারণ একজনকে পাইয়াছিলাম যিনি সংস্কৃত ভাষণে পটু। দেবীর ধ্যান যাহা শুনিলাম তাহাতে দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে —"গীতবাদিত্রপ্রিয়াম্"। ইহা তৃতীয় বিদ্যার লক্ষণ নহে, মাতঙ্গীরই বিশেষ লক্ষণ। মীনাক্ষী নামেরও একটা হেতু

শুনিয়াছিলাম। তাহা স্মরণ হইতেছে না। দেবীমূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তরের, দণ্ডায়মানা, দ্বিভুজা। গর্ভগৃহের দ্বার হইতে দেখিতে হইয়াছিল, নিরীক্ষণ করিয়াও স্তিমিত দীপের আলোকে সবিশেষ দেখা যায় না। বর্ণনায় শুনিলাম, এক হস্তে নীলোৎপল অপর হস্ত "লম্বহস্ত" ভাবেই অবস্থিত। মন্দিরের পূজায় গোলাপ ফুলের প্রাচুর্য। এক টাকার ফুল কিনিয়াছিলাম। স্তূপ করিয়া ফুল দিয়াছিল। পূজার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ—ঝুনা নারিকেল। প্রস্তরমূর্তির পীঠে ঠুকিয়াই পূজারীরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং নিবেদন করে। গর্ভগৃহটি প্রায় সর্বক্ষণ নারিকেলের জলে অভিসিঞ্চিত হইতেছে। কেবল এখানেই নয়, দক্ষিণের প্রায় সর্বত্র ইহা রীতি; বোম্বাই সহরের মহালক্ষ্মী মন্দিরেও এই রীতি দেখিয়াছি।

মন্দিরের পূজা ও প্রার্থনা সারিয়া রাজা তিরুমলের প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ এই রাজবংশেরই কীর্তি। বিশাল প্রাসাদ সু-উচ্চ স্তম্ভবহুল। প্রাসাদের বিশালতার ও উহার মধ্যস্থ স্তম্ভসংখ্যার একটা হিসাব তখন লইয়াছিলাম। এখন মনে হইতেছে না। প্রাসাদে এখন আর রাজ পরিবার বাস করেন না, উহা সরকারী দখলে। বড় বড় সরকারী আফিস উহার মধ্যে স্থাপিত। প্রাসাদ হইতে দেখিতে গেলাম রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা। তাহাও বিশাল এবং বিস্তীর্ণ। জনশ্রুতি এই, দীর্ঘিকা খননে যে মৃত্তিকা উঠিয়াছিল তাহাই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয়ের বিশালতা দেখিয়া তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

রাওয়ের নিকট হইতে বিদায়

দর্শনের কার্য সারিয়া রাওয়ের সহিত বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়া আহার সমাপ্ত করিয়া একটু বিশ্রামের সুযোগ পাইলাম। এখান হইতে ত্রিবান্দ্রম যাইব, গাড়ি ৫৷৷টায়। বিশ্রামের সুযোগ পাইয়া প্রথম কর্তব্য হইল গৃহে সংবাদ দেওয়া। চিঠি পৌঁছিবার ভরসা নাই। টেলিগ্রাম করিলাম। ঠাকুরাণীকে জানাইলাম মাদুরায় আসিয়াছি—কন্যাকুমারীর দিকে চলিয়াছি। ২৷৩ দিনের মধ্যেই ফিরিব। বাহিরে থাকিলে আমার অভ্যাস প্রত্যহ জননীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া থাকি। পণ্ডিচেরী আশ্রমে পৌঁছাইয়া যে পত্র লিখিয়া ফেলিতে দিয়াছিলাম আসিবার সময় সহসা দৃষ্টিতে পড়ে যে, তাহা অফিসঘরের টেবিলে পড়িয়া আছে। বৃদ্ধাচলম্ স্টেশনে একখানি পত্র লিখিয়া মাদ্রাজে ফেলিতে দিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহাও তো পৌঁছিতে সময় লাগিবে। তাহার পর আর কোন সংবাদই দিতে পারি নাই। তাহাতে উৎকণ্ঠা বাড়িয়াছিল। মাদুরা হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া খানিকটা স্বস্তি পাইলাম। মাদুরায় দ্বিপ্রহরে অসহ্য গরম। বরফ খাই না। কিন্তু সেখানে বরফ আনাইয়া জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে হইয়াছিল। তাহাতেও তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। যে ভৃত্যটিকে বরফ আনিতে বলা হইল রাও তাহাকে ডাকিলেন,—"আর্ম্ম"; আমি রাওকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, নামটি—আর্মুখম। বলিলাম, 'আমি যদি উহাকে সুব্রহ্মণ্যম্ বা ষন্মুখম্ বলিয়া ডাকি তাহা হইলে সাড়া দিবে কি?' রাও

হাসিয়া বলিলেন, 'তাহা কেমন করিয়া হইবে?' বৈকালে মাদুরা ছাড়িতে হইবে। কয়েক ঘণ্টার অবস্থিতি। তথাপি রাওয়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে মনে কোথাও একটা বেদনা বোধ হইতেছিল। তাহার অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। রাওয়ের সঙ্গে স্টেশনে আসিলাম, মাদ্রাজ হইতে ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস আসিতেছে তাহাতেই যাইতে হইবে। শুনিলাম গাড়ী 'লেট' করিয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ রাও-এর পরিচয় হইতেই এখানে স্টেশন কর্তৃপক্ষ এইটুকু অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভেসন না দিলেও টিকিট দিয়াছিলেন এবং একজন রেলওয়ে কর্মচারী গাড়ীতে আসিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন—'আপনি চলিয়া যান, কেহ আপনার বিঘ্ন ঘটাইবে না; রিজার্ভেসন বস্তুতঃ না পাইলেও কার্যতঃ আপনি পাইবেন কারণ এখান হইতে সেকেণ্ড ক্লাসে ভিড় হইবে না।' গাড়ী আসিল। রাও আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। নিবিড়ভাবে করমর্দন করিয়া বলিলাম—"Rao, it is a short acquaintance but worth remembering long." সত্যই স্বল্পকালের পরিচয় কেমন করিয়া দীর্ঘকালের স্মরণীয় হয় মাদুরায় তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

ত্রিবান্দ্রম অভিমুখে

গাড়ী ত্রিবান্দ্রম চলিল। মনটা খানিকটা হাল্কা হইল বটে যে, নির্ধারিত ভ্রমণতালিকা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আবার প্রবল হইয়া দেখা দিল। খানিকটা লঘু খানিকটা ভারাক্রান্ত চিত্তে বসিয়া বসিয়া দক্ষিণী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। অপরাহ্ণের ম্লান আলোক অধিকতর ম্লান হইয়া সন্ধ্যার আবছায়ায় মিলাইল। সন্ধ্যার আবছায়াকে ঢাকিয়া ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার নামিল। বাহিরে যখন আর কোনমতে দৃষ্টি চলে না. তখন গাড়ীর ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। সম্মুখের বার্থে আর একজন যাত্রী আছেন, গোটা কামরায় আমরা মাত্র দুইজন। কয়েকটা স্টেশন পরেই সঙ্কোটি নামক স্টেশনে তিনি নামিয়া গেলেন, অপর একজন উঠিলেন। তখন রাত্রি বাড়িয়া উঠিয়াছে। আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল না। নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রের আহার আজও বাদ গেল। মাদুরা স্টেশন ছাড়িবার সময়ে রাও এই সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া ফল কিনিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কিনিবার মত ফল পাওয়া যায় নাই। আমারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ভবিষ্যতের জন্য এত ভাবনা ভাবিয়া পথ চলা যায় না।

যখন ভোর হইল তখন কেরল রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার অঞ্চল এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য—ইহা লইয়াই কেরল। পূর্বোল্লিখিত সঙ্কোটি ষ্টেশনেই মাদ্রাজ প্রদেশ শেষ হইয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আরম্ভ ;

প্রদেশের দেশীয় নাম ব্যবহার করিলে বলিতে হয়—তামিল প্রদেশের শেষ হইয়া কেরল প্রদেশের প্রারম্ভ। প্রদেশের নাম কেরল, অধিবাসীদের বর্তমান আখ্যা মলয়ালী এবং ভাষা মলয়ালম্। প্রদেশটি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কিন্তু পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলার সহিত ইহার অদ্ভুত সাদৃশ্য—প্রাকৃতিক পরিবেশে, মানুষের চেহারায় এবং ভাষার ধ্বনিতে। গাড়ীতে চলিতে চলিতে মনে হইতে লাগিল বাঙলাদেশের বন-প্রকৃতির মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দুই পাশে নীচু নীচু কুটীর, কুটীরসংলগ্ন বেড়ার উপর দিয়া রক্তজবার গাছ বাহিরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আর প্রস্ফুটিত পুষ্পশোভায় হাসিতেছে। কোথাও কদলীপুঞ্জ এবং তাহাদের সুচিক্কণ পত্রবিস্তারের মধ্যে পরিপূর্ণ ফলভারের স্নিগ্ধশ্রী; কোথাও অযত্ন-প্রস্ফুটিত ধুতুরা ও আকন্দ; বাঙলাদেশের কুটীরগুলির চাল নির্মিত হয় গোলপাতা, ছণ বা খড় দিয়া। এখানে দুই রকম মিশাইয়া ছাওয়া। নারিকেলপাতা দিয়া হইয়াছে প্রথম ছাউনী; তাহার উপর দ্বিতীয় ছাউনী সুপারীপাতার। দেখিয়া বুঝিলাম এখানে অন্ততঃ সুপারী গাছ আছে। সর্বাপেক্ষা বিশেষ সাদৃশ্য দেশের অভ্যন্তরভাগে জলের প্রাচুর্যে; জল জমিয়া থাকে, সমুদ্রের Backbay হইতে আসিয়া জমে, বর্ষার জলোচ্ছ্বাসেও আসিয়া জমে; লোকে নৌকায় চলাচল করে। অবশ্য এ সাদৃশ্য প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গেরই সঙ্গে। সাদৃশ্য এত বেশী যে পূর্ববঙ্গে যেমন গ্রাম্য জলপথের ধার দিয়া যাইবার সময় স্থানে স্থানে বদ্ধজল হইতে একপ্রকার পঙ্কিল গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে এখানে দেখিলাম তাহারও অভাব নাই।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বসিবার পর রাত্রির নূতন সহযাত্রীটির সহিত আলাপের সুযোগ হইল। যুবক, সুদর্শন, ভদ্র। পরিচয়ে জানিলাম তিনি সরকারী কর্মচারী তুতিকোরিণ হইতে বদলী হইয়া ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছেন। আমার পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল আমি মলয়ালী; বাঙালী বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। আলাপে মনে হইল ত্রিবান্দ্রমের অবস্থার সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত। প্রথমেই আমাকে স্থানীয় লোকজন সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া সাবধানে চলিতে বলিলেন; বলিলেন লোকের সহিত ব্যবহারে আমি যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া চলি, কারণ সুযোগ পাইলেই তাহারা ঠকাইবে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশশাসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেশব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, সে অভিযোগ তাঁহার মুখেও শুনিলাম। বুঝিলাম এ বিষয়ে উত্তর-দক্ষিণে কোন ভেদ নাই। অভিযোগ—সরকারীমহলে দুর্নীতির প্রাবল্য, ব্যবসায় ক্ষেত্রে কালোবাজারের উদ্ভব এবং উহার দমনের পরিবর্তে, প্রতিকারের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের উৎসাহে, অবহেলায় বা সহযোগিতাতেই উহার প্রসার ও পরিপুষ্টি। খাদ্যশস্যের দর বাড়িতেছে। সরকারের উদ্দেশ্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ। কোথায় কাহার নিকট উহা মজুদ আছে তাহা সরকারী কর্মচারীরা জানে। কিন্তু তাহা জানায় না, সংগ্রহ করে না, অসঙ্গত ভাবে প্রভাবিত হয়। এই অবস্থার হেতুস্বরূপ তিনি আর একটা যে সংবাদ দিলেন, তাহা আরও চমৎকার। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন মিলিয়া যে রাজ্য-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে পুলিশেরাই

সর্বময় কর্তা। মন্ত্রীরা পর্যন্ত পুলিশকে ভয় করিয়া চলে। জনৈক মন্ত্রী স্বীয় মন্ত্রিত্বকালে দুর্নীতি ও কালোবাজারের প্রতিকারে সচেষ্ট হইয়া পুলিশের এক বড় কর্মচারীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মন্ত্রিমণ্ডলের অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘর্ষে তিনি মন্ত্রিত্বপদ হারাইলেন। পূর্বোক্ত পুলিশ কর্মচারীটি কিন্তু তখনও স্বপদে বহাল। এইবার তিনি পূর্ব আক্রোশ মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে তিনি একটি মিথ্যা মামলা সাজাইয়া তাঁহাকে এমন জড়াইলেন যে, শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েদে যাইতে হইল। সংবাদপত্রে কাজ করিয়া দুর্নীতি, কালোবাজার, পুলিশ প্রভৃতির জগাখিচুড়িতে অনেক বিচিত্র সংবাদ লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কেরল প্রদেশে পুলিশী আধিপত্যের যে সংবাদ পাইলাম এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

ত্রিবান্দ্রমে সমস্যা

আলাপ করিতে করিতে গাড়ী ত্রিবান্দ্রমের কাছে আসিয়া পড়িল। দূর হইতে ষ্টেশনের আবেষ্টন দেখিয়াই বোঝা গেল সমুদ্র সন্নিকট। চতুর্দিকে বালুকাস্তূপ। স্টেশন দেখা দিতেই মনে হইল সহযাত্রীটির সহিত বিচ্ছেদ আসন্ন। সঙ্গকাতর মন এতক্ষণ ইঁহাকেই একান্ত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। মনে হইয়াছিল পথের এই সাক্ষাৎ ও পরিচয় নিতান্তই ঘটনাচক্র। কিন্তু স্টেশনে উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা ঘটনাচক্র নহে। যে দেবতা আপনার অশেষ করুণায় নিঃসহায় পথযাত্রীর 'যোগক্ষেমের' ভার লইয়াছিলেন এবং যিনি যন্ত্রিরূপে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়া আমাকে একাকী দক্ষিণের পথে পথে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিতেছিলেন এ চক্র তাঁহারই। বস্তুতঃ সহযাত্রীটিকে না পাইলে আমাকে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইত। মাদুরা স্টেশনে নামিতেই যেমন রাও আসিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন, এখানে সেরূপ ঘটিল না। মাদ্রাজের বন্ধুটি এখানে এক জনের ঠিকানা দিয়াছিলেন এবং মাদুরা হইতে তাঁহার নামে একটা টেলিগ্রামও পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু স্টেশনে নামিয়া দেখিলাম কেহই উপস্থিত নাই। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চারিদিকে নজর করিতেছি এমনসময় এক যুবক আসিয়া সম্ভাষণ জানাইয়া বলিল, তাহার মনিব সহরে উপস্থিত নাই, মফঃস্বলে গিয়াছেন। আমার প্রয়োজনমত আমি যেন স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লই এবং রেলওয়ে হোটেল হইতে খাবার আনাইবার বন্দোবস্ত করি। তাহার কথা শুনিয়া সহসা যেন অথৈ জলে পড়িয়া গেলাম। মাদুরায় রাওয়ের আতিথেয়তার পর ত্রিবান্দ্রমে এই অভ্যর্থনা মনকে বড় আঘাত করিল। খাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য আমার তেমন কোনো ভাবনা ছিল না। দুই একদিন উহা না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যে সময়টুকু থাকিব, তাহার জন্য একটা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয় চাই এবং কাছাকাছি লোক চাই যাহারা আমার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বুঝিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কাজের দ্রুত যোগাযোগের উপায় হওয়া চাই কারণ আমাকে অল্পকার মধ্যেই কাজ মিটাইয়া ফিরিতে হইবে। রেলওয়ে বিশ্রামকক্ষে একা বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্তের মতো থাকিলে

ইহা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ সহযাত্রীটি গাড়ীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে অপরিচিত অবস্থায় একা থাকিতেও ইতস্ততঃ বোধ হইতেছিল। মনে মনে স্থির করিলাম আর যাহাই হউক স্টেশনে থাকিব না; অন্য কোন উপায় না জুটিলে যুবকটির সঙ্গেই যাইব; তাহার নিশ্চয়ই একটা আস্তানা আছে। আর তাহাও যদি না জোটে গাড়ীর সহযাত্রীটিকেই আশ্রয় করিব। আমার মাত্র কয়েক ঘন্টার স্থিতি। ইহাতে বিশেষ আর কি অসুবিধা হইবে? নিজে তো ঘুরিয়াই বেড়াইব। আস্তানার দরকার শুধু একটু দাঁড়াইবার জন্য ও স্যুটকেসটি রাখিয়া যাইবার জন্য।

এই অবস্থায় সহযাত্রীটির নিকট হইতে যে সাহায্য ও সমর্থন পাইয়াছিলাম, তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখিয়াছি। ত্রিবান্দ্রমের যুবক যখন আমার দায় লইতে অস্বীকার করিল, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে আমার পক্ষ লইয়া একটু শক্ত হইয়াই যুবককে বলিলেন—"একজন নবাগতকে এইরূপ অসহায়ভাবে স্টেশনে ফেলিয়া যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না।" আমাকে সম্বোধন করিয়া তিনি স্পষ্টভাবেই বলিলেন—"এইভাবে থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" খানিকটা বোধ হয় তাঁহার চাপে পড়িয়াই যুবক শেষ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইল। ঠিক হইল তাহার মনিবের বাসাতেই গিয়া উঠিব। সমস্ত ব্যাপারটা বড় তিক্ত লাগিতেছিল কিন্তু উপায় ছিল না; শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবার ঠাঁই মিলিতে সোয়াস্তি বোধ করিলাম।

কন্যাকুমারী যাওয়ার ব্যবস্থা

থাকার ব্যবস্থা স্থির হওয়ার পর অনুষ্ঠেয় কার্যের কথা। বলিলাম—আমি অদ্যকার মধ্যে কাজ সারিয়া কালই বিমানে মাদ্রাজ ফিরিতে চাই। কাজের মধ্যে প্রধান—স্থানীয় পদ্মনাভ-মন্দিরে দেবদর্শন এবং কন্যাকুমারী দর্শন। মন্দিরের দর্শন প্রথমেই সারিয়া লইব এবং তাহার পর বৈকালের দিকে যাইব কন্যা-কুমারী—ইহাই কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সে কল্পনা কাজে আসিল না। যুবক বলিল—এখন দেবদর্শন হইবে না। মূলমন্দিরে দেবগৃহের দ্বার বেলা ১০টায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে ছাড়া দর্শন মেলে না। সুতরাং একদিনে দুই কাজ হইয়া উঠিবে না, কল্যকার জন্য অপেক্ষা করিতেই হইবে। যুবক যে পরামর্শ দিল তাহা এইরূপ—আজ কন্যাকুমারী গিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই দর্শন সারিয়া লওয়া এবং রাত্রিটা স্থানীয় কেপ হোটেলে থাকিয়া পরদিন ভোরে ফিরিয়া আসা। যাত্রীরা ইহাই করিয়া থাকে। কারণ কন্যাকুমারী তীর্থে সমুদ্রসঙ্গম ও কুমারীদেবতা যেমন দর্শনীয় তেমনই দর্শনীয় বস্তু পূর্বসমুদ্রে সূর্যোদয় এবং পশ্চিম সমুদ্রে সূর্যাস্ত। রাত্রিটা না থাকিলে সূর্যোদয় দর্শন ঘটে না। যুবক বলিল, যে মোটর 'বাস' সন্ধ্যায় ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্যাকুমারী যায় তাহা রাত্রিতে তথায় অপেক্ষা করে এবং প্রাতে ফিরিয়া আসে। সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিয়া প্রত্যুষেই তাহাতে ফিরিয়া আসা যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া পদ্মনাভ দর্শন করিতে পারি। এই ব্যবস্থায় সকাল

৮টার মধ্যে পদ্মনাভ দর্শন খানিকটা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। তথাপি কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা না পাইয়া আপাততঃ এই পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। পরামর্শ স্থির হইবার পর যুবক বলিল—এখনই টিকিট করিয়া সিট রিজার্ভ করিয়া রাখিতে হইবে, নহিলে স্থান মিলিবে না। ইহাও স্থির হইল আমাকে যাইতে হইবে এক্সপ্রেস গাড়ীতে উহা সোজা কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যায়, সময় লাগে কম। এক্সপ্রেস গাড়ীতে ভাড়া একটু বেশী' কিন্তু সাধারণ গাড়ীতে গেলে পথে বদল করিতে হয়, অনেক সময় লাগিয়া যায়। যুবকের পরামর্শ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ টিকিট করিতে বলিলাম। স্টেশনের সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বেই 'বাসের' অফিসঘর। যুবক দৌড়াইয়া গিয়া টিকিট করিয়া আসিল—মূল্য ৩৷৶১০। আড়াইটার গাড়িতে 'সিট' রিজার্ভ হইল।

এই সকল ব্যাপার চলিতেছিল—এতক্ষণ পর্যন্ত ট্রেণের সহযাত্রীটি আমার সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার একটা গতি হইল ইহা না দেখিয়া তিনি যাইতে পারিতেছিলেন না। সমস্ত মিটিবার পর ট্যাক্সি ডাকিয়া নিজে ভাড়া ঠিক করিয়া দিলেন এবং যুবকের ও আমার সহিত নিজেও উঠিলেন। যতটা সম্ভব পথ একত্রে গিয়া তিনি নামিয়া গেলেন। কোন্ রহস্যময় বিধান পরম প্রয়োজনের ক্ষণে এই স্বল্পকালের জন্য তাঁহাকে আমার চলিবার পথে আনিয়া দিয়াছিল জানি না। কিন্তু সেই স্বল্পক্ষণের পরিচয়ই স্মৃতিতে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে।

যুবকের সহিত বাসায় পৌঁছিয়াই সুসংবাদ শুনিলাম, তাহার গৃহস্বামী মফঃস্বল হইতে ফিরিয়াছেন ; দেখা হইল না, কারণ আসিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাসাও অফিস-সংলগ্ন, তবে রাওয়ের বাসার মত প্রশস্ত ও সুবিন্যস্ত নহে। বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসগৃহের ব্যবস্থা যে রকম হয়, অনেকটা সেই রকম। যে যুবকটি আমাকে আনিতে গিয়াছিল, সে অফিসে কাজ করে, সম্ভবতঃ প্রয়োজন হইলে গৃহকার্য্যেও সহায়তা করিয়া থাকে। আমি যে দিন পৌঁছাইয়াছি সে দিন একটা বিশেষ সুবিধা—রবিবার। অফিস বন্ধ। সুতরাং আমার প্রতি মনোযোগ দিবার এবং আমার কাজে সহায়তা করিবার অবসর আছে।

কন্যাকুমারী যাইবার ব্যবস্থা

স্নানাদি সারিয়া গৃহস্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ফিরিলে আলাপ হইল। অল্প বয়স, আলাপী এবং আলাপে ভদ্র। প্রথমেই তাঁহাকে বলিলাম, দীর্ঘকাল থাকা আমার উদ্দেশ্য নহে। সম্ভব হইলে অদ্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কালই বিমানে ফিরিতে চাহি। যুবকের সহিত পরামর্শে আমার কার্যপদ্ধতি যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহার পরামর্শ আমার কাজে আসিল। তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে আজই কন্যাকুমারী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারি। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখা হইবে না। বেলা ২॥০ টায় যে 'বাসে' যাইবার জন্য আমি টিকিট করিয়াছি, তাহা কন্যাকুমারী পৌঁছাইয়া দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসে। আমি যদি

দুই ঘণ্টার মধ্যে দর্শন সারিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে সন্ধ্যার অল্প পরেই ফিরিয়া আসিতে পারিব এবং প্রত্যুষে উঠিয়া পদ্মনাভ দর্শন সারিয়া মধ্যাহ্নের বিমানে মাদ্রাজ রওয়ানা হইয়া যাইতে পারিব। পূর্ব-সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিবার আগ্রহ থাকিলেও সময় সংক্ষেপ করিবার এই ব্যবস্থায় আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কারণ রাত্রিটা কন্যাকুমারীতে কাটাইতে হইলে পরদিন পদ্মনাভের দর্শনলাভে যে অনিশ্চয়তা ঘটে আজই ফিরিয়া আসিতে পারিলে সে অনিশ্চয়তা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পদ্মনাভদর্শন নিশ্চিত না হইলে আমার ফিরতি পথে যাত্রা করার কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয় না। গৃহস্বামীর কথায় সম্মত হইলাম, বলিলাম, 'যে করিয়া হউক কন্যাকুমারীতে দর্শন সারিয়া আজই ফিরিয়া আসিব। কাল পদ্মনাভ দর্শন সারিয়া যাহাতে মাদ্রাজ রওয়ানা হইয়া যাইতে পারি, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।' তৎক্ষণাৎ প্রথম কর্তব্য হইল কল্যকার বিমানে আসন সংগ্রহ করা। এখান হইতে মাদ্রাজ যাতায়াত করে টাটার এয়ার ইণ্ডিয়া লাইনের বিমান। গৃহস্বামীর সহিত বিমানগ্রহে গিয়া সিট রিজার্ভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাড়া লাগিল ১০০৲। কলিকাতা ছাড়িবার পর এই প্রথম পথের সম্বলের হিসাব লইলাম। দেখিলাম প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে বিমানে মাদ্রাজে আসিবার সময়ে রিটার্ণ টিকিট করিয়া আসিয়াছিলাম। মাদ্রাজ হইতে ফিরিতে তাহাই সম্বল। নহিলে কলিকাতা পৌঁছাইবার মতো অর্থও অবশিষ্ট নাই।

বিমানগ্রহের কাজ সারিয়া স্থানীয় পোষ্ট আফিসে। মাদ্রাজে টেলিগ্রাম করিয়া পরদিন পৌঁছিবার কথা জানাইলাম এবং সেই রাত্রিতেই কলিকাতায় রওয়ানা হইবার জন্য বিমানে সিট রিজার্ভ করিতে বলিলাম। পোষ্ট আফিসে নোট ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলাম, এখানে এখনও ত্রিবাঙ্কুরী মুদ্রার চলন আছে। ভিক্টোরিয়া যুগে বৃটিশ ভারতে যেমন ডবল পয়সার বড় বড় তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, ত্রিবাঙ্কুরী তাম্র মুদ্রাও সেই প্রকার, মূল্যও আমাদের দুই পয়সার সমান, মহারাজার নামাঙ্কিত। পোষ্ট আফিসের কাজ শেষ হইবার পর হাতে কিছু সময় রহিল। গৃহস্বামীর সহিত মোটরে ত্রিবান্দ্রম শহরটি দেখিতে বাহির হইলাম। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। মাদুরায় রাওকে দেখিয়া এবং ত্রিবান্দ্রমে গৃহস্বামীকে দেখিয়া ধারণা হইল এখানে যাহারা সাধারণ বেতন পায়, তাহারাও নিজেরা একটা মোটর রাখে। গাড়ীটা নিজেরাই চালায় এবং কলকব্জার কাজও মোটামুটি শিখিয়া লয়, যাহাতে সাধারণ মেরামতীর কাজও নিজেরাই চালাইয়া লইতে পারে। ইহাতে কিছু ঝামেলা পোহাইতে হয় বটে, কিন্তু যথাসম্ভব কম খরচে গাড়ী রাখা যায়। হাতের কাছে মোটর থাকিলে কর্মশক্তি বহু-গুণে বৃদ্ধি পায় এবং লোকের সহিত ব্যবহারে মর্যাদাও বাড়ে।

ত্রিবান্দ্রম শহর

গৃহস্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে ঘুরিয়া শহরটি মোটামুটি একবার দেখিয়া লইলাম। প্রথম দর্শনে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে

এই ধারণাই মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে যে, ত্রিবান্দ্রম কেবল প্রাসাদময়ী নহে, উহা উদ্যানময়ী নগরী। প্রশস্ত রাজপথ এবং পথের উভয় পার্শ্ববর্তী গৃহসংলগ্ন উদ্যানে শোভিত নগরীর দৃশ্য কেবলই কলিকাতার উত্তর শহরতলী অঞ্চল স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। পথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সর্বত্র সমতল নহে। কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে; দক্ষিণের অনেক শহরের ন্যায় এ শহরও পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। শহরের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে গির্জার আধিক্য। ভ্রমণ করিতে করিতে পদ্মনাভ-মন্দিরেও একবার ঘুরিয়া আসিলাম। দেবদর্শনের উপায় ছিল না। মন্দিরের বহিরাবেষ্টন দেখিয়া লইলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগে বিশাল ও উচ্চ গোপুরম্ মেরামত করা হইতেছে—সু-উচ্চ বেষ্টনীতে আচ্ছন্ন। সুতরাং তাহা ভাল করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মন্দিরটি দুর্গ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। মন্দির পরিদর্শন শেষ করিয়া শহরতলীর দিকে অগ্রসর হইলাম এখানকার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ তাম্পির সহিত সাক্ষাতের জন্য। ডাঃ তাম্পি ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভক্ত ও শিষ্য। কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইবার সময়ে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিপুরানন্দের নিকট হইতে তাঁহার নামে একটি পত্র লইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, দরকার হইলে তাঁহার আশ্রয় লইব। আশ্রয় মিলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সহিত কেবল দেখা করিতে গেলাম। স্বামী ত্রিপুরানন্দ তাঁহার নিকটেও পত্র দিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলাম তিনি অসুস্থ, গৃহে নাই, দেখা হইল তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্রের সহিত। দেখিলাম তাঁহাদের গৃহে স্বামী নির্মলানন্দের পটমূর্তি পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চিত হইতেছে।

শহর পরিদর্শনের পর গৃহে ফিরিয়া গৃহস্বামীর সহিত আলাপের একটু সুযোগ পাইলাম। প্রথমেই একটা কৌতূহল-জনক তথ্য উদ্ধার হইল, বলিলাম, আপনি পদবী'ত নামমাত্র লেখেন। কিন্তু এই নাম কখনও নামের পদবী হইতে পারে না। আসল পদবীটা কি? তিনি হাসিয়া উহা স্বীকার করিলেন এবং আসল পদবীটা বলিলেন; পদবীটি ব্রাহ্মণের। কিন্তু তাহা বলিয়া পরিচয় দিলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমস্যা উঠিবে। এইজন্য উহা একেবারেই চাপা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মণ পরিচয়ে সুবিধা কিছু নাই; বরং অসুবিধাই ঘটে। তাঁহার নিকট শুনিলাম কেবল তিনি নহেন, অনেককেই এইরূপ চাপা দিয়া চলিতে হয়। এখন সরকারী ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ পরিচয়টা সুযোগ-সুবিধা লাভের হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে স্থানীয় শাসন-সমস্যার কথাও উঠিল। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন একত্র হইয়া যুক্তরাজ্যে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও উহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই। মধ্যে অন্তর্বিরোধ বর্তমান। যুক্ত শাসন-পরিষদে ত্রিবাঙ্কুরেরই প্রাধান্য, কোচিনের প্রতিনিধি যতগুলি থাকা উচিত, তাহা নাই। ইহা কোচিনের পক্ষে ক্ষোভের কারণ। মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে নানারূপ অপকৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে—রাজপ্রমুখের পরিবারবর্গের এখনও প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস আছে।

কন্যাকুমারী

আলাপ ও আহারের পর কন্যাকুমারী যাইবার জন্য বাহির হইলাম। 'বাস-স্ট্যাণ্ডে' যখন উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ২॥টা। গৃহস্বামী 'বাসের' কনডাক্টরকে আমার কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন কন্যাকুমারীতে পৌঁছাইয়াই আমাকে ফিরিবার টিকিট দেয়। ইহাতে সিট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি দর্শনাদি করিতে পারিব এবং সময়মতো 'বাসে' আসিয়া বসিব। ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্যাকুমারী যাত্রা আমার ভ্রমণে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। মন তখন অপূর্ব আগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে যাইতেছি, দ্বিতীয়তঃ আমার ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট তালিকা সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তৃতীয়তঃ ৫৫ মাইল পথ যাইতে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় লাগিবে, এতদ্দিন কেবল তামিল রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। এইবার মলয়ালী বা প্রাচীন ভারতের ভাষায় কেরল রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত দেখিবার সুযোগ পাইব।

তামিল ও কেরল

মাদ্রাজে নামিয়া যখন তামিলরাজ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, তৎকালে রঘুবংশে সমুদ্রবর্ণনের দুইটা শ্লোকের ছত্র বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল—সমুদ্রের উপকূলদৃশ্যের বর্ণনা—দূর

হইতে এবং নিকট হইতে। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একটি শ্লোক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপায় সর্বত্র সুপরিচিত—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বি
তমালতালীবনরাজীনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"

(কপালকুণ্ডলায় উদ্ধৃত) *

লঙ্কা হইতে বিমানে সমুদ্র অতিক্রম করিবার সময়ে যে তালীবন-শ্যাম উপকূলরেখা শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা তামিল রাজ্যের বেলাভূমি। দূর হইতে দেখিতে কেবল দেখা গিয়াছিল বনানীর শ্যামরেখা। কিন্তু জলরাশি ছাড়াইয়া রামচন্দ্রের বিমান যখন বেলাভূমিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং

* সমুদ্র-কূল বর্ণনার উৎকর্ষ হিসাবে কালিদাসের এই শ্লোকটি সর্বত্র প্রখ্যাত হইলেও অনুরূপ আর একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায় যাহার উৎকর্ষ, এতটা না হইলেও, কম নহে—

এলালবঙ্গবকুলামলকীতমাল-
হিন্তালতালদলতাণ্ডবখণ্ডিতাগ্রে
প্রান্তে পতল্লবণবারিধিদীর্ঘতীরং
রেখা বভাবানিলভাস্বরশৈলমূর্দ্ধি,

[যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ—নির্বাণপ্রকরণ, উত্তরার্ধ ১৩৩ অঃ]

এ বর্ণনাটিও মলয়সমুদ্রকূলের। দ্বিতীয় চরণে "দল" শব্দটির স্থানে "জল" এই পাঠান্তর আছে।

তীরবনস্থলী আরও সবিশেষে দৃষ্টির গোচরে আসিয়াছে. তখনকার বর্ণনা অন্যরূপ—

"এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-
পর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ
প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমানবেগাৎ
কূলং ফলাবর্জিত-পূগমালম্"

—রঘুবংশ, ১৩শ সর্গ

তখন দৃষ্টিতে পড়িতেছে তীরভূমিতে ফলভারে অবনত স্থপারিগাছের প্রাচুর্য। তামিল রাজ্যে ভ্রমণের সময় তালীবন দেখিয়াছি; কিন্তু তমাল চোখে পড়ে নাই। আর ধনুষ্কোটি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও সুপারিগাছ দেখি নাই। এখন 'ফলাবর্জিত-পূগমালম্' দেখিতে হইলে নোয়াখালির সমুদ্রতীরে যাইতে হইবে। নারিকেলগাছের প্রাচুর্য তামিল রাজ্যের দক্ষিণে দেখিয়াছি, কিন্তু কলিদাসের বর্ণনায় তাহার উল্লেখ নাই।

তামিলরাজ্যে প্রবেশের সময়ে যেমন রঘুবংশের শ্লোকের ছত্র মনে পড়িতেছিল, তেমনি কেরলরাজ্যে প্রবেশের সময়ে স্মরণে উঠিতে লাগিল একটি বহুপ্রচলিত উদ্ভটশ্লোকের এক ছত্র—"কেরলী-কেশপাশে"। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নারীরূপ কোথায় কোন শরীরাংশে উৎকর্ষ পাইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে সুললিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সমগ্র শ্লোকটি এই—

"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক-জনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে।
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং॥

তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে।
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জরীণাং স্তনেষু॥

কবে কোন্ রূপদক্ষ এই রূপবৈশিষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না; কিন্তু কয়েক ছত্রের মধ্যে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা রচয়িতার রুচি ও দৃষ্টি উভয়ের নিপুণতা প্রমাণ করে। শ্লোকটির মতে সৌন্দর্য্যাভিমানী দেবতার বিশেষ প্রকাশ মথুরাবাসিনীদের বাক্যে, মৈথিলীদের কটাক্ষে গৌড়সুন্দরীগণের সুচারু দন্তপঙ্‌ক্তিতে, উৎকল-প্রিয়াদিগের লালিত্যময় জঘনে, তৈলঙ্গ-নারীদিগের নিতম্বে, কেরল-মহিলাদের মেঘবরণ ঘন কেশদামে, কর্ণাটীদের কটিতে এবং গুর্জরবাসিনীদের স্তনদেশে।

কেরল-রমণীদের সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে এই বহুকাল--প্রচলিত উক্তির প্রমাণ কিছু দেখা যায় কি না, তজ্জন্য কৌতূহলী হইয়া লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। ইহা অবশ্য সর্বত্র সুলভ দৃশ্য নহে। তথাপি পথে কিছু না কিছু নজরে পড়িবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তামিল-রাজ্যের মধ্যে যেমন তমাল দেখিতে পাই নাই, তেমনি কেরলেও "কেশপাশ" চোখে পড়িল না। ট্রেণের সহযাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সেই "সজলঘনরুচি" সুদীর্ঘ কেশপাশ রাখিবার অভ্যাস আছে কি না। তিনি বলিলেন, তুই পুরুষ পূর্বেও ছিল, এখন উঠিয়া যাইতেছে। সুদীর্ঘ কেশপাশ যাহারা রাখিত, তাহাদের কেশচর্যার বিশেষ পদ্ধতিও ছিল। সে পদ্ধতির ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে

এবং লোকে তাহা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে কেশ-তৈল ব্যবহারের কথাটাও উঠিল। বাঙলাদেশের ন্যায় তামিল এবং কেরলেও দুই প্রকার তৈলের প্রচলন—স্নানে ও রন্ধনে। এক রাজ্যে কেশের জন্য তিল তৈল এবং রন্ধনে নারিকেল তৈল, অপর রাজ্যে উহার বিপরীত।

ভুপ্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতি

আলোচনা-প্রসঙ্গে যখন তামিল ও কেরলের তুলনামূলক বৈশিষ্টের কথা উঠিয়াছে, তখন এই সুযোগে আরও কয়েকটা বিষয় বলিয়া রাখি। তামিলে ও কেরলে ভুপ্রকৃতি ও মনুষ্য-প্রকৃতি উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য দেখা যায়। উভয় রাজ্যই সমুদ্র-তীরবর্তী, উভয় রাজ্যই গিরি-উপত্যকায় অবস্থিত, তথাপি পার্থক্য আছে। দ্রুত ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে যতদূর ধরা পড়িয়াছে, তামিলে শুষ্কতা প্রধান এবং কেরলে আর্দ্রতা প্রধান। এমন কি দেহাবয়বে ও ভাষায় পর্যন্ত ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। তামিলের লোকের দেহ ও মুখাবয়বের সাধারণ বৈশিষ্ট—শুষ্কতা ও রুক্ষতা। কেরলের লোকের মধ্যে স্নিগ্ধতা ও চিক্কণতা। ভাষা কোনো অঞ্চলেরই বুঝি নাই। কিন্তু ধ্বনি-বিচার হইতে বুঝিয়াছি, তামিলের ভাষায় শ্রুতিকটু ব্যঞ্জনের প্রাধান্য, আর কেরলের ভাষায় স্নিগ্ধ ও কোমলের। তামিলের ভাষা শুনিলেই রবীন্দ্রনাথের বৈয়াকরণের কথা মনে পড়িয়া যায়—

"মিশাইয়া লয়ে ধুলায় কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে।"

মলয়ালী ভাষা নামে যেরূপ কাজেও তাহাই—লকার-ধ্বনি-প্রধান আর তাহাতেই পাইয়াছে অসাধারণ কোমলতা—মনে হয় জলপ্রবাহের অস্ফুট ধ্বনি ও গতি যেন উহার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে।

ভূ-প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যে প্রধানতঃ যাহা চোখে পড়ে তাহা উদ্ভিদ-সম্পদের। প্রধানতঃ তাল ও নারিকেলের। তামিল রাজ্যে প্রথম প্রবেশের মুখে কেবল তালীই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। পূর্ব সমুদ্রের তীরভূমি ধরিয়া যত দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছি ক্রমশঃ দেখিয়াছি তালীর সহিত নারিকেলের* সংমিশ্রণ এবং পরে নারিকেলেরই আধিক্য। পূর্ব-প্রান্ত হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম একেবারেই নারিকেলের প্রাধান্য। কুটীর নির্ম্মাণে নারিকেলপাতার ছাউনী ব্যবহার হয় পূর্বে বলিয়াছি। প্রচুর নারিকেল গাছ—বাঙলা দেশের গাছের মত এত দীর্ঘ নহে—কিন্তু সজীব, শ্যামল, চিক্কণ এবং ফলও প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন নারিকেল খাওয়া হইবার পর খোলটি ফেলিয়া দেয় এখানে তাহা করে না। গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া চালান হয় দেখিলাম—সম্ভবতঃ দড়ি তৈয়ারীর কারখানায়। খোলগুলি

---

* আমরা একমাত্র "নারিকেল" শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আরও দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে—"নারিকের" এবং "নালিকের"।

কাটিবার একটু বিশেষত্ব আছে—আমরা দুই খণ্ড করিয়া কাটি। ইহারা কাটে তিন খণ্ড করিয়া—এক একটি শির লইয়া এক এক খণ্ড। পথে দেখিয়াছি—গাড়ী গাড়ী এইরূপ কাটা খোল চালান যাইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া আর একটা বস্তু দেখিয়াছি—বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মতো—'ট্যাপিওকা' (Tapioca)। ভারতে খাদ্যাভাবের সমস্যা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে এই ট্যাপিওকার নামটা খুব চল হইয়াছে। চাউল ও গম জাতীয় প্রধান খাদ্যের পরিবর্ত হিসাবে যে সকল খাদ্যের ব্যবস্থা সরকারী মহল হইতে দেওয়া হইয়াছে 'ট্যাপিওকা' তাহার অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় ইহার কথা অনেকবার শুনিয়াছি এবং কৌতূহল বোধ করিয়াছি। এতদিন বাদে বস্তুটিকে দেখিবার সুযোগ পাইয়া বড় আনন্দ হইল। ছোট ছোট গাছ দেখিতে অনেকটা রেড়ীর গাছের মত—এক সঙ্গে চাষ হয়। ইহার মূলটা খণ্ড খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করিয়া ভাতের বদলে আহার করে। দরিদ্র পরিবারে এ আহার প্রচলিত। কিন্তু সরকারী প্রচার শুনিয়া বস্তুটিকে যতটা সহজগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল সন্ধান লইয়া জানিলাম বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহাতে একরূপ মাদকতা আছে। অনভ্যস্ত লোকে খাইলে মাথা ঘোরে। কাটিয়া কুটিয়া এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া জলটা ফেলিয়া দিলে ইহার খানিকটা প্রতিকার হয়—সবটা হয় না। সেইজন্য যাহারা অভ্যস্ত নহে তাহারা ব্যবহার করিতে চাহিলে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। যতদূর বুঝিলাম ট্যাপিওকা বস্তুটি যে সকল অঞ্চলে

প্রচলিত সেই সকল অঞ্চলেই কেবল ইহা পাল্টা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে—অন্যত্র নহে। এ অঞ্চলেও সাধারণ খাদ্য হিসাবে ইহার প্রচলন নাই।

বস্ত্র ও আভরণ

আর দুইটি কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব—পুরুষদের বস্ত্র-পরিধান এবং নারীদের অলঙ্কার। দক্ষিণবাসী পুরুষদের কাপড় দুই পাট করিয়া লুঙ্গির মত পরা আমরা কলিকাতাতেও দেখিয়াছি। কিন্তু এই পরার মধ্যেও উভয় রাজ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য কাপড়ের কসি গোঁজা লইয়া। তামিলীরা বাঁদিকে কসি গুঁজিয়া কাপড় পরে আর মলয়ালীরা পরে ডানদিকে গুঁজিয়া। এক পক্ষের কাপড়ের ভাঁজ পড়ে বাঁদিকে অপর পক্ষের পড়ে ডানদিকে। উভয়ত্রই লোকের সাধারণ পোষাক—কাপড় দুই পাট করিয়া লুঙ্গির মত পরা—কাঁধে রঙীণ গামছা। লম্বালম্বি দুই পাট করা কাপড়টি কাহারও কাহারও আবার নীচের দিক হইতে পুনরায় দুই পাট করা অর্থাৎ কাপড়টি লুঙ্গির মত পরিবার পর পুনরায় পায়ের দিক হইতে উল্টাইয়া কোমরে গুঁজিয়া হাঁটু পর্যন্ত তোলা হইয়াছে। ইহাকে loin clothও বলা যাইতে পারে বা আমাদের দেশের গামছা পরাও বলা যায়। পোষাকটি তেমন শোভন নহে। কিন্তু ব্যবহারকারীরা বলে এইভাবে উল্টাইয়া হাঁটু পর্যন্ত উঠাইয়া লইলে চলিবার বেশ সুবিধা হয়। আমার কিন্তু চলিবার সুবিধা ছাড়া ইহার আরও একটা বিশেষ উপকারিতা

চোখে পড়িল। এই উপায়ে কাপড়টা প্রকারান্তরে ৪ পাট করিয়া পরা হয়। সুতরাং উহা যে চতুর্গুণ টিকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা কাপড় পরি এক পাট, কোচা ঝুলাই, তাহাতে কাপড় নষ্ট হয় তাড়াতাড়ি। এখন কাপড়ের কষ্ট; সেইজন্যই—বস্ত্ররক্ষার দিকটাই আমার চোখে বিশেষ করিয়া ঠেকিল। অবশ্য এইভাবে ৪ পাট করিয়া কাপড় পরা ছাড়া অন্তর্বাস পরিবার রীতিটাও ইহাদের মধ্যে বেশ প্রচলিত।

পুরুষদের বস্ত্রপরিধানের এই বৈশিষ্টের সহিত নারীদের মধ্যে লক্ষ্য করিতেছিলাম কর্ণাভরণের বৈচিত্র। কেরলের কর্ণাভরণই বিশেষ উল্লেখের। এরূপ কর্ণাভরণ ভারতের কুত্রাপি দেখি নাই। বাঙালীর দৃষ্টিতে বিচার করিলে বস্তুটা কতকগুলি সোণার মাদুলী গাঁথিয়া প্রস্তুত। উপরের দিকে মাদুলীর সংখ্যা বেশী, চওড়া ও ভারী, নীচের দিকে ক্রমশঃ সংখ্যা কমিয়াছে এবং সরু ও হাল্কা হইয়া আসিয়াছে। প্রমাণ করতলের এক মুঠায় বস্তুটি ধরিবে না। ইহাই দুলের মত করিয়া দুই কাণে ঝুলানো। ঝুলাইবার প্রথম অবস্থায় কিরূপ থাকে বলিতে পারি না। কারণ এই অলঙ্কার পরিহিতা কোন নবীনাকে দেখি নাই। পথে যে কয়জনকে দেখিয়াছি সকলেই বর্ষীয়সী। তাহাদের কর্ণ ও কর্ণাভরণের অবস্থা দেখিয়া মেঘনাদবধের বর্ণনা মনে পড়িত—

"রসনা ত্যজিয়া শ্রোণী নিতম্ব পরশে"

অলঙ্কারের ভারে কানের নিম্নভাগ নামিয়া আসিয়াছে এবং অলঙ্কারটি স্কন্ধ স্পর্শ করিতেছে, কাহারও কাহারও বা স্কন্ধ

ছাড়াইয়াছে। কাণের নীচের এই ক্ষুদ্র অংশটুকু যে এতখানি বাড়িতে পারে তাহা পূর্বে ধারণা করিতে পারি নাই। কাণের বিঁধের পরিসর বাড়িয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া মুষ্টি চলিয়া যায়।

পথের অভিজ্ঞতা

অনেকক্ষণ অন্য কথা বলিয়াছি। এইবার আবার পথের কথায় ফিরিয়া আসি। 'বাস' চলিতে থাকিল। ৫৫ মাইল পথ, যাইতে সময় লাগে, থামিতেও হয় অনেক-বার। ইহারই মধ্যে স্থানীয় লোকচরিত্র ও রীতিনীতি কিছু কিছু দেখিবার অবসর পাইলাম। বাস-এ লেখা আছে—'ধূম-পান নিষেধ'। দেখিলাম আরোহীরা ইহা বর্ণে বর্ণে মানিয়া চলে। লঘুচরিত্র বাঙালীর মত অগ্রাহ্য করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করে না। থামিবার জায়গায় আসিয়া গাড়ী থামিলে যাহাদের ধূমপানের প্রয়োজন তাহারা নামিয়া যায় এবং ধূমপান সারিয়া গাড়ী ছাড়িবার সময়ে পুনরায় ওঠে। লোকের এই নিয়ম-নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না—কাহাকেও কোন অনুরোধ করিতে হয় না—কাহাকেও সমালোচনা করিতেও শোনা যায় না। মানিয়া চলিব এইটাই বুদ্ধি—কোনমতে এড়াইয়া চলিব—ইহা তাহাদের বুদ্ধিতে নাই।

মলয়ালী ভূমির সহিত বাঙলার এবং মলয়ালীদিগের সহিত বাঙ্গালীর সাদৃশ্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'বাস'-এ

চলিতে চলিতে তাহা আরও বিশেষভাবে অনুভব করিলাম। স্থানে স্থানে বাজার বা হাটের সম্মুখে আসিয়া ‘বাস’ থামিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে বিভ্রম হইতেছিল বুঝি বা বাঙ্গলা দেশের মধ্য দিয়াই চলিতেছি। ইহারা যদি বাঙ্গালীর মত করিয়া কাপড় পরিত তাহা হইলে পূরাদস্তুর বাঙ্গালী বলিয়া চলিয়া যাইত। একদা যখন বাংলার অর্ণবপোত ভারত-সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত তৎকালে কি এই প্রদেশের সহিত বাঙ্গালীর যোগ হইয়াছিল? বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সিংহলে যাতায়াত করিত এ ঐতিহ্য শ্রীমন্ত সওদাগর পর্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। কেরলের ন্যায় সুপরিচিত ও মনোরম স্থানে আসিয়া তাহারা যদি রহিয়া গিয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

হাটে বাজারে যেখানে গাড়ী থামিতেছিল তথায় উৎপন্নদ্রব্যসমূহ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। নারিকেলের প্রাচুর্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আর দুইটি বস্তুর প্রাচুর্য বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য। আম্র ও কদলী। এ দুইটিরই প্রাচুর্য ও অনেক রকমারী বাঙ্গলাদেশে বর্তমান। কিন্তু এখানে যে রকমারী দেখিলাম বাঙ্গলায় উহা দেখি নাই। সুপুষ্ট কদলী, অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণ, স্তরে স্তরে সজ্জিত—একটা দেখিবার বস্তু। এই শ্রেণীর ফল বাঙ্গলায় দেখা যায় না। পূর্ব বাঙ্গলার “অগ্নিবর্ণ” বলিয়া এক শ্রেণীর কদলীফলের কথা শুনিয়াছি। তাহা হয়তো এইপ্রকার হইতে পারে।

গাড়ীতে চলিতে চলিতে আর একটি বস্তু লক্ষ্য করিতে-

ছিলাম—মাইলস্টোন। মাদ্রাজ হইতে রওনা হইবার পরই ইহা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রত্যেক মাইল স্টোনে একদিকে দিল্লী অপরদিকে নাগের-কয়েলের দূরত্ব লেখা। দিল্লী সুপরিচিত—কিন্তু নাগেরকয়েলটি কোথায় আর তাহার এমন প্রাধান্যই বা কেন সেই কথা বারবার মনে হইয়াছে। ভ্রমণের শেষ সীমায় আসিয়া আমার সে সন্দেহ ভঞ্জন ঘটিল। কন্যা-কুমারী যাইতে পথেই নাগেরকয়েল। নাগেরকয়েল ভারতের দক্ষিণতম সহর—কন্যাকুমারীর ১২ মাইল আগে। ভারতের দক্ষিণতম সহর বলিয়াই ইহার গুরুত্ব এবং মাইল-স্টোনে ইহার উল্লেখ। বাসের পথেও নাগেরকয়েল একটি প্রধান ষ্টেশন—অনেক লোক ওঠা-নামা করে দেখিলাম।

কন্যাকুমারীর তীরে

নাগেরকয়েল ছাড়াইবার কিছু পরেই গাড়ী কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া থামিল। মনে হইল জীবনের পরম কাম্যবস্তু একে-বারে প্রত্যক্ষ হইয়া ধরা দিয়াছে। গাড়ী যেখানে থামে তথা হইতে সমুদ্রতীরে পৌঁছিতে সামান্য কিছু হাঁটিতে হয়। এখন স্মরণ করিয়া যতদূর মনে হইতেছে সেটুকু পথ বোধ হয় ছুটিয়াই গিয়াছিলাম—শিশুর মত আনন্দে। সমুদ্রপ্রান্ত পর্বতময়, দাক্ষিণাত্য-উপত্যকার দুই দিকের দুই পর্বতমালা এই এই শেষ বিন্দুতে মিলিত হইয়া যেন এক অপূর্ব রক্ষাবেষ্টনী রচনা করিয়াছে। কন্যাকুমারীতে নামিতেই একটি ছোকরা গাইড জুটিয়া গেল। কিন্তু তাহার সাহায্য

বেশীক্ষণ লাগে নাই। নাগেরকয়েল হইতে একটি যাত্রী উঠিয়াছিলেন, দেখিয়া মনে হইল বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কন্যাকুমারীতে নামিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় হইল। আমাকে সঙ্গে লইয়া ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত-বিন্দু দেখাইয়া দিলেন। সেখান হইতে দৃশ্য অপূর্ব—তিন সমুদ্রের সম্মিলন। বামে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং সম্মুখে ভারত মহাসাগর। তিন দিক পরিবেষ্টন করিয়া সমুদ্র,—গিরিপ্রাচীরের গাত্রে ক্রমাগত আহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। স্তব্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে "কুমারসম্ভবের" কবির বর্ণনার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম—

"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"

মহামহিমার সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আপনা হইতেই মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল—

"প্রণমি তোমারে আমি সাগর-উত্থিতে
ষড়ৈশ্বর্যময়ী অয়ি জননী আমার।
তোমার শ্রীপদরজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার॥"*

দৃশ্য দেখিবার ও অনুভব করিবার—বলিয়া বুঝাইবার নহে।

"বাস" হইতে নামিয়া সোজা তীরভূমিতে পৌছাইলে প্রথমেই কন্যাকুমারী তীর্থের স্নানের ঘাট। ইহাকে মাতৃতীর্থ

* শঙ্খ—অক্ষয় কুমার বড়াল

বলে। ঘাটটি চমৎকার। তিন দিক হইতে তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ ও মনোরম স্নানের স্থান রচিত হইতে পারে ইহা এক বিচিত্র পরিকল্পনা। চারিদিককার গিরি-বেষ্টনীর মধ্যে সমুদ্রের একাংশ যেন একটি সরোবরে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার সহিত কৃত্রিম পরিবেষ্টনী যোগ করিয়া ও মধ্যে মধ্যে মোটা শিকল আঁটিয়া উহাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করা হইয়াছে। শিকলগুলি থাকায় সহসা কাহারও ভাসিয়া বাহিরে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নিবারিত হইয়াছে। ঘাটে যথারীতি পাণ্ডারও অভাব নাই। বহুলোক স্নান করিতেছে। আমাদের "বাসের" কণ্ডাক্টর যুবকটিও দেখিলাম স্নান করিতে নামিল এবং স্নান সারিয়া কপালে বিভূতি বা শ্বেতচন্দন লেপন করিয়া উঠিয়া আসিল। তাহার স্নানস্নিগ্ধ মূর্তিটি বেশ স্মরণে রহিয়া গিয়াছে; বুঝিলাম বাস-কণ্ডাক্টরের কার্য করিলেও আচারনিষ্ঠা হারায় নাই। নামিয়া স্নান করিবার আগ্রহ আমারও হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উপকরণ বা অবসর কোনোটিই ছিল না।

'বিবেকানন্দ রক'

স্নানঘাট হইতে বরাবর সম্মুখে, কিছু ব্যবধানে, সমুদ্রের মধ্যে তিনটি পর্বতের চূড়া দেখা যায়। ইহার সর্বশেষ চূড়াটির নাম হইয়াছে 'বিবেকানন্দ রক্'। ইহা সরকারী নাম নহে। স্থানীয় অধিবাসীরাই এই নাম দিয়াছে। ভারত পরিক্রমা করিতে করিতে এই শেষ প্রান্তে আসিয়া স্বামীজী

আপনার সাধনার পরম উপলব্ধির অনুকূল স্থানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সমুদ্র সন্তরণ করিয়া সর্বশেষ চূড়াটিতে উঠিয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই জন্যই চূড়াটির 'বিবেকানন্দ' নামকরণ। এই স্থানে ধ্যানরত অবস্থাতেই তিনি ভারতের সেবায় প্রবৃত্ত হইবার এবং সমুদ্রপারে যাইবার প্রত্যাদেশ লাভ করেন। ঘটনার এই বিবরণ পূর্বেই শুনিয়াছিলাম কিন্তু ইহার মর্ম সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কেবলই মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছি—এত স্থান থাকিতে স্বামীজী ভারতের এই দক্ষিণতম ক্ষেত্রকেই আপনার অনুকূল বলিয়া নির্বাচন করিলেন কেন? প্রত্যক্ষে সমুদ্রসঙ্গমের মহিমময় রূপ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিতে পারিলাম কুমারী দেবীকে দর্শন করিয়া। অনন্তসত্তার সংযোগলাভে সমাকুল সসীম মানবসত্তা যদি কোথাও আপনার পরম সিদ্ধিলাভ করে তো কুমারীদেবতার পদতলে সমুদ্রসঙ্গমের এই মহাতীর্থে নিশ্চয়ই করিবে।

বৈশাখ মাস; দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। ধীরে ধীরে অপস্রিয়মান রৌদ্র তখনও সম্মুখভাগের তরঙ্গশীর্ষে নাচিতেছে, দূরের সমুদ্রভাগ মনে হইতেছে আবছায়ায় আচ্ছন্ন। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের জলরাশি যেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, তথায় উভয়ের সন্ধিরেখা দৃষ্টিগোচর হয় শুনিয়াছিলাম। বঙ্গোপসাগরের ঘোলা সাদা জলের সহিত আরব সাগরের নির্মল নীল জলের সংমিশ্রণ এক বৃহত্তর গঙ্গাযমুনা-

সঙ্গম বা পদ্মামেঘনা-সঙ্গমের দৃশ্য। শুনিয়াছিলাম, শুভ্রতা ও নীলিমার এই সম্মিলন-রেখা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা দেখিতে পাইলাম না— আলোকের অস্পষ্টতার জন্য হউক বা অন্য যে কারণে হউক। একটা প্রবল আগ্রহে আশাভঙ্গ ঘটিল।

সূর্যাস্ত দর্শন হইল না

আরও একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অ-দৃষ্ট রহিয়া গেল— সমুদ্রে সূর্যাস্ত। ভারতভূমির সর্বদক্ষিণ বিন্দুর অবস্থান হইতে ভূমিরেখা পূর্বে ও পশ্চিমে যেভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্বে বঙ্গোপসাগরের দিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, দক্ষিণে ভারত সমুদ্র তো উন্মুক্ত বটেই। সুতরাং সমুদ্রে সূর্যোদয় সকল ঋতুতেই দেখা যায়। কিন্তু পশ্চিমে ভূমিরেখা চক্রবালের দিকে অনেকদূর প্রসারিত হইয়া যেভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে তাহাতে আরব সমুদ্রের দৃষ্টিগোচর অংশ অনেকটা কম, দক্ষিণ দিকের কাছাকাছি কিছু অংশ দেখা যায় কিন্তু একটু উত্তরে সরিলেই ভূমিরেখায় দৃষ্টি বাধিয়া যায়। ফলে সমুদ্রে সূর্যাস্ত সকল সময়ে দেখা যায় না। শীতকালে সূর্য যখন দক্ষিণায়ণে তখন সমুদ্রে সূর্যাস্ত দৃষ্ট হয় বটে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তরায়ণে। দিকচক্রবালে যেখানে সূর্যাস্ত ঘটে সেখানে ভূমিরেখা। আমার যে এতটা স্মরণ ছিল তাহা নহে। সঙ্গের ছোকরা গাইডটি যখন বুঝিল আমি সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি তখন সে-ই ইহা স্মরণ করাইয়া দিল,

বলিল 'সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখিতে চাহেন তো শীতকালে আসিবেন, গ্রীষ্মকালে উহা দেখা যায় না।' হেতুটা মনে মনে বুঝিলাম। কিন্তু আগ্রহের নিবৃত্তি হইল না। সীমারেখা ধরিয়া দ্রুত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সমুদ্রাংশ আরও বেশী দেখা যায় কি না তাহারই চেষ্টা করিলাম। যত অগ্রসর হইতে থাকিলাম দিকসীমাও ততই যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। কোথাও দৃঢ়, কোথাও শিথিল. কোথাও শুষ্ক. কোথাও পিচ্ছিল পাষাণস্তূপের উপর দিয়া আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া একটি যুবক সতর্ক করিল। এখানে সমুদ্রে প্রবল চোরাটান—কোনমতে তাহার মুখে পড়িলে একেবারে তলাইয়া যায়। কথাটায় সচকিত হইলাম। এই দূরদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণপর্ব প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। এখন কন্যাকুমারী দেবীকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইলেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারি। এখান হইতে রওয়ানা হইবার আর একটু সময় বাকী আছে তাহারই মধ্যে দেবীর দর্শন সমাপ্ত করিতে হইবে। সুতরাং ক্রমাগত দূরাপসারী দিগন্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের অপর অংশে সূর্যাস্ত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষান্ত করিতে হইল। তথা হইতে ফিরিলাম এবং বালুকাময় তটভূমি অতিক্রম করিয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম।

কুমারীর মন্দির

সমুদ্রের তীরে জলাঙ্করেখা হইতে সামান্য দূরেই কুমারীর মন্দির। দেখিলে মনে হয় কুমারীর পাদমূলে

মুদ্র আসিয়া অবনমিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছে—দেবী যেন ঙ্গিতে তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পুণ্যভূমির র্বদক্ষিণ প্রান্তে দেবী কুমারী সমুদ্রসঙ্গমের দিকে চাহিয়া যেন সতর্ক অধিদেবতার মত দাঁড়াইয়া আছেন; দেবতার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির মিলন ঘটিয়াছে; সমুদ্রকূল যেন কুমারীর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে পরিণত হইয়াছে। অবিরাম তরঙ্গাভিঘাত উপেক্ষা করিয়া এখানে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির সংস্থাপন অসাধারণ দুঃসাহস। মন্দির কেমন করিয়া এতদিন অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহাও এক বিস্ময়। মন্দির দক্ষিণে ও পশ্চিমে সম্পূর্ণই প্রাচীর-বেষ্টিত। উত্তরে ও পূর্বে দ্বার; পূর্বদ্বার দিয়াই দেবীমূর্ত্তি সমুদ্র হইতে সোজাসুজি দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু ইহা অবরুদ্ধ। প্রচলিত কাহিনী এই যে, দেবীর ললাটস্থ হীরকখণ্ড রাত্রে দীপালোকে এমন ঝলমল করিতে থাকে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সমুদ্রগামী জাহাজ মন্দিরের দিকে চলিয়া আসে এবং এবং জলমধ্যস্থ পাহাড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিধ্বস্ত হয়। বারবার এইরূপ ঘটিতে থাকায় অবশেষে মন্দিরের পূর্বদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন উত্তরের সিংহদ্বারই একমাত্র প্রবেশপথ।

সমুদ্রতীর হইতে মন্দিরে আসিতে পথে এক বাঙালী পরিবারের সহিত দেখা। তাঁহারা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছেন এবং সন্নিকটেই ঘর লইয়া আছেন। তাঁহাদের সহিত আলাপে মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিধি

জানিতে পারিলাম। বিধিটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরে যাইতে হইলে কেবল ধুতিচাদর গায়ে যাইতে হয়, জামা-গেঞ্জী প্রভৃতি গায়ে দিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। এইসব গায়ে থাকিলে সিংহদ্বারের সম্মুখে খুলিয়া যাইতে হয়। এই ব্যবস্থার অর্থ সকলে হয়তো বোঝে না। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে—সেলাইকরা বস্তু গায়ে দিয়া দেবতার কাছে যাওয়া চলিবে না। সেলাইকরা বস্ত্রাদি গায়ে রাখিয়া দেবকার্য করিতে নাই এরূপ বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। বাঙলা দেশে ইহা আমরা মোটামুটি মানিয়া চলি, যদিও উত্তর--ভারতীয়দের মধ্যে দেখিয়াছি, পিরাণাদি গায়ে দিয়া ধর্মকার্য করিবার এবং করাইবার চলন। কিন্তু সেলাইকরা বস্তু গায়ে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না তাহা এই প্রথম দেখিলাম—দক্ষিণের শেষ প্রান্তে আসিয়া। ইহার পর ত্রিবান্দ্রমে পদ্মনাভ-মন্দিরেও ইহা দেখিয়াছি। তবে সেখানকার ব্যবস্থার আরও কড়াকড়ি। পদ্মনাভ মন্দিরে প্রবেশের সময়ে দেহের ঊর্ধ্বাংশে কোন আবরণই রাখিতে দেওয়া হয় না। উত্তরীয় সঙ্গে রাখিতে হয় বটে কিন্তু কোমরে জড়াইয়া বড়জোর পাট করিয়া বুকের নিম্নভাগে আঁটিয়া। কুমারীর মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতেই দ্বাররক্ষক গায়ের জামাগেঞ্জি খুলিয়া ফেলিতে বলিল কিন্তু সেগুলির ভার লইবার কোনো লোক নাই, দ্বাররক্ষকও লয় না। অগত্যা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলি দ্বারপথের পার্শ্বে ফেলিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরের

গঠনে দক্ষিণী প্রণালীর যে জটিলতার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা এখানেও দেখা গেল। কতগুলি অলিন্দ ও চত্বর ঘুরিয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কুমারীর মূর্তি

কুমারীর মূর্ত্তি দর্শন মাত্র মনে যে অনুভূতি জাগিল তাহা অপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, দৈব অনুভূতি। মন যেখানে বর্ণনার ও ভাষার অতীত স্তরে আরোহণ করে ইহা সেই স্তরের অনুভূতি। মনে হইল ভারতবর্ষের মাটিতে শরীরগ্রহণ সার্থক হইয়া গেল। কন্যাকুমারীর দর্শন লাভ যাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই ভারতসন্তান হিসাবে তাহার জীবন অসম্পূর্ণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য অপরিপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সুশুভ্র শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তি—নিতান্ত বালিকার প্রতিচ্ছবি। পাথরের মূর্তি এমন জীবন্ত হয়! প্রস্তরমূর্তির দৃষ্টিতে ও সজীব মানুষের দৃষ্টিতে ভাববিনিময় হইতে পারে! অনেকদিন হইয়া গিয়াছে এবং অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সেই ভাবব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি এখনও যেন দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছে। মনে হয়, যে সাধক দেবীকে এই রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং যে সাধকশিল্পী সেই প্রত্যক্ষ দর্শনকে প্রস্তরে রূপ দিয়াছিলেন তাঁহারা যেন উপলব্ধির প্রত্যেকটি ইঙ্গিত এই মূর্তির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চাপা ঠোঁটে ঈষৎ হাসি, নয়নে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। মনে হয় বালিকা হাসিতে

হাসিতে খেলিতে চাহিতেছে—খেলিতে না পাইয়া বুঝি অভিমান করিয়াছে এবং অভিমানে চক্ষু বুঝি বা সজল হইয়া উঠিতেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলাম। আমার যে দ্রুত ফিরিবার তাগিদ আছে তাহাতে বিস্মৃতি ঘটিয়া গেল। অবশেষে পাণ্ডার অনুরোধে সচকিত হইয়া অন্য যাত্রীদের দর্শনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারী তীর্থে আপনার সাধনক্ষেত্র করিয়াছিলেন পূর্বেই বলিয়াছি। শুনিয়াছি কন্যাকুমারী তীর্থ ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রিয়শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ মনঃপূত ছিল। দেবীর মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন —দেবী এখানে জাগ্রত। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক ভারতসন্তানের এ মূর্তি দর্শন করা উচিত নহিলে তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কুমারীদেবীকে দর্শনের সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে সেই বুঝিবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উক্তির অর্থ কি?

কুমারীর কাহিনী

দেবীতীর্থমাত্রেই দেবীর সহিত ভৈরব আছেন; কিন্তু কন্যাকুমারীর বিশেষত্ব এখানে ভৈরবরূপে শিব উপস্থিত নাই। দেবী যে কুমারী, থাকিবেন কেমন করিয়া? এখান হইতে কিছু দূরে সূচীন্দ্রম নামক স্থানে মহাদেব রহিয়াছেন। স্থানটি কন্যাকুমারী আসিতে পথে পড়ে, মূল পথ হইতে একটু সরিয়া যাইতে হয়। সূচীন্দ্রম

যাওয়া আমার হইয়া উঠে নাই। শুনিয়াছি তথায় প্রকাণ্ড শিবমূর্তি; মন্দিরের গঠনপারিপাট্যও চমৎকার এবং সুচীন্দ্রম মন্দিরটি স্তম্ভের অপূর্ব কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। দেবী কুমারী-তীর্থে এবং মহাদেব সুচীন্দ্রমে ইহা লইয়া একটি করুণ কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি বিবাহ বিভ্রাটের, যাহার ফলে মহাদেব রহিয়া গিয়াছেন সুচীন্দ্রমে এবং শিবের সহিত মিলন না ঘটায় দেবী রহিয়া গিয়াছেন এই তীর্থে চিরকালের মত কন্যা-কুমারী হইয়া। কাহিনীতে বলে দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বাছিয়া বাছিয়া এই স্থানটি নির্বাচিত হইয়াছিল। লোকে লোকে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছে; বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ; স্বর্গমর্তপাতালের অধিবাসীরা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন; ভোগ্য ও ভোজ্য বস্তুর প্রচুর সংগ্রহ; দেবী বিবাহের বেশে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখন শিব আসিবেন। শিবও বরযাত্রীদের লইয়া উত্তরদিক হইতে যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পথে বিঘ্ন ঘটিল: দেবতাদের কাজে বিশেষ বিশেষ সময়ে যিনি বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন এ বিঘ্নকারকও তিনি—দেবর্ষি নারদ। একটা কাণ্ডকারখানা বাধাইয়া পথে শিবকে তিনি আটক করিয়া রাখিলেন। শিব আসিলেন না। প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া বহিয়া গেল বিবাহের ক্ষণ। কন্যার মুখের হাসি আশাভঙ্গের অশ্রুতে মিলাইয়া গেল; আসন্ন মিলনপ্রত্যাশার ক্ষণে ঘটিল চিরবিচ্ছেদ। উৎসবের জন্য আগত অতিথিরা ভগ্নমনে ফিরিয়া গেলেন। দেবীর অন্তরের বেদনা স্থাবরজঙ্গমচরাচরে

সঞ্চারিত হইল। বিবাহোৎসবের জন্য প্রস্তুত ভোজ্যান্ন পর্যন্ত সেই বেদনায় পাথর হইয়া গেল। আজও তীর্থযাত্রীদিগকে তাহার নিদর্শন দেখানো হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রবেশপথ পাচিত তণ্ডুলকণার আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণায় পরিপূর্ণ। সন্নিকটে আর কোথাও ইহা নাই। এগুলির নামও "অন্নপ্রস্তর"। ইংরাজীতে বলে— "Rice Sands."*

কন্যাকুমারী-দর্শন সমাপ্ত করিয়া স্থানীয় "কেপ হোটেলটি" দেখিতে গেলাম। মন্দির হইতে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। এখানকার এই হোটেলটি বিখ্যাত। ইহা একেবারে সমুদ্রের কূলে অবস্থিত। ইহার উপর হইতে দেখা যায় তিনদিকে উন্মুক্ত সমুদ্র-শোভা। সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

* কাহিনীটি ত্রিবাঙ্কুরে একটু পৃথকভবেে প্রচলিত। দেবী কুমারী কুমার বা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, এখানকার নাম সুব্রহ্মণ্যম্। সুব্রহ্মণ্যম্ এ অঞ্চলের প্রধান দেবতা। তাঁহার সহিত কুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না, উভয়েই অবিবাহিত রহিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্ত কাহিনীর রূপান্তরমাত্র। ৺চণ্ডীতে দেখা যায়, রক্তবীজযুদ্ধে দেবগণের শক্তি দেবীকে সাহায্য করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে কার্ত্তিকেয়ের শক্তির নাম কৌমারী। কিন্তু ইহারা দেবশক্তিরূপে আসিলেও যে বস্তুতঃ দেবীরই অংশ তাহা চণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে— "যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥" উল্লেখযোগ্য যে ইহারা অবশেষে দেবীর দেহেই বিলীন হইয়া যান। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ৺চণ্ডীতে উল্লিখিত দেবী কৌমারীর প্রণামমন্ত্রেই কুমারীদেবীকে প্রণাম করিতে হয়।

দেখিতে যাহারা আসে তাহারা এখানেই এক রাত্রি কাটায়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে এখান হইতে সমুদ্রের যে রূপ দেখা যায় তাহার তুলনা নাই। হোটেলে গিয়া দেখি, নাগেরকয়েলের পূর্বপরিচিত ভদ্রলোকটি তথায় উপবিষ্ট। আমাকে দেখিয়াই হোটেলের কর্তৃপক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন—"কলিকাতা হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক আসিয়াছেন। ইঁহার যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা করুন। ইনি সুখ্যাতি করিলে আপনার উপকার হইবে।" ভারতবর্ষে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া এই একটা আশ্চর্য দেখিয়াছি, "আনন্দবাজার পত্রিকার" নাম সবত্র অত্যন্ত সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছে। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা কেমন করিয়া এই সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে তাহা সংবাদপত্র-জগতের বিস্ময়। হোটেলের কর্তৃপক্ষ সহৃদয়তার সহিত আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাদ্যসম্বর্ধনায় আমার প্রয়োজন ছিল না। আতিথ্যের নিদর্শনস্বরূপ এক গ্লাস জল গ্রহণ করিলাম। হোটেলটি ঘুরিয়া দেখাইলেন—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত ও সুব্যবস্থিত।

ত্রিবান্দ্রম হইতে আগত "বাসটি" যাত্রী নামাইয়া দিয়া এই হোটেলের হাতার মধ্যে আসিয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। হোটেল পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সদ্যঃস্নাত ও বিভূতিচন্দনচর্চিত কণ্ডাক্টরটি ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। "বাস" হইতে নামিবার

সময় রিটার্ণ টিকিট চাহিয়াছিলাম, দেয় নাই। সুতরাং সিট্ পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়া "বাসে" উঠিতে হইল। তখন সন্ধ্যা ৭টা হইবে। আমি উঠিয়া বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী ছাড়িল এবং অন্ধকারময় পথ দিয়া রাত্রি ৯৷৷টায় পুনরায় ত্রিবান্দ্রমে আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম বাস-স্টেশনে ত্রিবান্দ্রম-গৃহস্বামীর কর্মচারী যুবকটি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্যাক্সি করিয়া তাহার সহিত বাসায় পৌঁছিলাম। তাহার পর আহারাদি সমাপ্ত করিয়া শয়নের উদ্যোগ। কয়েকদিনের পর এই প্রথম গৃহাচ্ছাদনের মধ্যে রাত্রিযাপনের সুযোগ মিলিল; মিলিল বটে কিন্তু দেখিলাম, এক হিসাবে গাড়ীই ভাল ছিল। তাহাতে মশার উপদ্রব ছিল না। বিনিদ্র রজনীযাপনের ক্লেশ লাঘব করিল বর্ষায়। দক্ষিণের সমুদ্রকূলের বর্ষণ—নারিকেলপত্রের মধ্য দিয়া ঝির ঝির করিয়া ঝরিতে লাগিল, বাতাসে শীতলতার সঞ্চার হইল। সেই শব্দের কোমলতা ও শৈত্যের স্নিগ্ধতা নিবিষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতেছি—সহসা উৎকট ধ্বনি—মনে হইল যেন কামান গর্জন। কিছুক্ষণ পর পরই এইরূপ ধ্বনি হইতে থাকিল। শব্দটা কামানগর্জনের নহে কিন্তু বজ্রপাতের ধ্বনি হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক্ রকমের। কারণ কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পরে সন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম সমুদ্র নিকটে বলিয়াই এইরূপ ধ্বনি সময়ে সময়ে শ্রুত হইয়া

থাকে। "বরিশাল গানের"* কথা শুনিয়াছি; জলপাইগুড়িতে থাকিতে তিস্তা নদীর তীরে বসিয়াও লক্ষ্য করিয়াছি, নিয়মিত সময় অন্তর কামানগর্জনের ন্যায় একটা ধ্বনি শোনা যায়। ইহার রহস্য মীমাংসিত হয় নাই। দক্ষিণরাজ্যের সমুদ্রকূলের বর্ষা ও মেঘাড়ম্বরের রাত্রিতে সহসা এইরূপ উৎকট ধ্বনির রহস্য কি প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন।

* পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। তথায় মধ্যে মধ্যে কামানগর্জনের ন্যায় শব্দ শোনা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইহা শাসকবর্গের ভীতির কারণ হইয়া ওঠে এবং "Barisal Gun" অর্থাৎ "বরিশাল কামান" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(১০)

পদ্মনাভ-মন্দিরে

প্রত্যূষে উঠিয়াই স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পদ্মনাভ-মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গৃহস্বামী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। ৮টার মধ্যে দর্শন সারিয়া লইতে হইবে। তাহার পর মহারাজের পূজার পালা। তিনি পূজা করিয়া গেলে আর কাহারও দর্শন হইবে না। রাজ্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মানুষের অধিকারে নহে, দেবতার অধিকারে। শ্রীপদ্মনাভস্বামীই ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতি। রাজা তাঁহার সেবকরূপে ইহা পরিচালনা করেন মাত্র। এইজন্য তাঁহার পরিচয়—"পদ্মনাভদাস"। কেবল দেবতার পূজা নহে, মন্দিরের পরিচর্যার কাজও তাঁহারই। এ নিয়ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্দির-মার্জনা করিতে হয়। মন্দিরে তাঁহার বিশেষ অধিকার এইটুকু—গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ বেদিকায় উঠিয়া দেবতাকে প্রণাম করিতে একমাত্র তিনিই অধিকারী। শ্রীপদ্মনাভস্বামীর পাদপদ্মে যাহার সর্বস্ব নিবেদিত নহে সেরূপ কাহারও এ অধিকার নাই। সাধারণ সকলকে নাটমন্দিরের শেষে বেদিকার নীচে থাকিয়া প্রণাম করিতে হয়।

মন্দিরটি বাহির হইতে কালই দেখিয়াছিলাম। আজ উহার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার সুযোগ ঘটিল। দক্ষিণ

ভারতের পূর্বাঞ্চলের মন্দিরসমূহের গঠন ও কারুকার্য হইতে পশ্চিমাঞ্চলের এই মন্দিরটির গঠনে ও কারুকার্যে পার্থক্য আছে যদিও মূল পরিকল্পনাটা একই প্রকারের। প্রাতঃকাল; দেবতার সজ্জা ও পূজার আয়োজন হইতেছে; মন্দিরাভ্যন্তর অনুষ্ঠান-গাম্ভীর্যে গম্‌গম্ করিতেছে। দেবতার সম্মুখে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ একযোগে "বিষ্ণুসহস্রনাম" পাঠ করিতে করিতে দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। স্বর, ধ্বনি, সুর ও উচ্চারণের সমাবেশে অপূর্ব অনুষ্ঠান! গৃহস্বামী আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশের সময়েই তাঁহার পরামর্শ মতো দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করিয়া উত্তরীয় বক্ষের নীচে নামাইয়া বাঁধিয়া লইতে হইয়াছিল। চত্বর ও অলিন্দাদি অতিক্রম করিয়া গর্ভগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানকার দেবমূর্তি শ্রীরঙ্গমের অনুরূপ বলিয়া বোধ হইল। তবে এখানে গর্ভগৃহের মধ্যে আলোক কিছু বেশী থাকায় এবং লোকাধিক্য ও পাণ্ডাপুরোহিতের তাড়া না থাকায় একটু দাঁড়াইয়া দেখিবার ও পূজা করিবার সুবিধা পাইলাম। মন্দিরে তৎকালীন অনুষ্ঠানের সংযোগে, জনসংঘট্টশূন্য প্রশান্ত পরিবেশে ব্যাঘাতহীন দর্শনের সুযোগ পাইয়া অন্তরে অন্তরে সুগভীর প্রসন্নতা অনুভব করিয়াছিলাম। গর্ভগৃহমধ্যে অনন্ত-শয্যাশায়ী নারায়ণের বিরাট মূর্তি—বামহস্ত রহিয়াছে পার্শ্বে লম্বভাবে এবং দক্ষিণহস্ত ভর করিয়া আছে শিয়রের নিকটে উপবিষ্ট শিবের মস্তকে। পদতলে উপবিষ্টা ধরিত্রী ও লক্ষ্মী।

যত দূর মনে হইতেছে, দেবতা দক্ষিণশিরা হইয়া শায়িত। শ্রীরঙ্গমের মূর্তির অবস্থান দেখিয়া যে প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠিয়াছিল এখানেও তাহা উঠিল। এই বিশাল মূর্তি এই সঙ্কীর্ণদ্বার কক্ষের মধ্যে স্থাপিত হইল কিরূপে? অনুসন্ধানে ইহার যে উত্তর পাইয়াছিলাম তাহাই একমাত্র মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মূর্তি প্রথমে, মন্দির পরে। মূর্তিটি একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কাটিয়া গঠিত, তাহার পর মূর্তিকে বেষ্টন করিয়া গর্ভগৃহ ও মন্দির নির্মিত। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে যাহারা শ্রীরঙ্গম্ ও ত্রিবান্দ্রমের বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল তাহাদের ক্ষমতা ও কৃতিত্বে বিস্মিত হইতে হয়।

দর্শন ও পূজা সারিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া যখন বাহিরের চত্বরে আসিয়াছি পূজক সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দেবগৃহের একাংশে আসিয়া বলিলেন—"এই দিকটায় প্রভুর পাদপদ্ম, এইখানে প্রণাম করুন।" "বিষ্ণুসহস্রনাম" স্তোত্র হইতে নারায়ণের যে প্রণামমন্ত্র বালককালেই পিতাঠাকুরের নিকট শিখিয়াছিলাম, সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া তাহাই একান্ত-চিত্তে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—

"নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্তয়ে
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ।"

আমার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পূজক নিজেও ইহা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শুনিয়া মনে অপূর্ব ভাবাবেশ জাগিল। সত্তার গভীরে ভারতের সুদূর পূর্বসীমান্তবাসীর সহিত দক্ষিণ-সীমান্তবাসীর আধ্যাত্মিক একাত্মতা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম এই বিশাল ও দূরপ্রসারী দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোন্ সূত্রে ইহার ঐক্য বিধৃত ও রক্ষিত হইয়াছে।

দক্ষিণী মন্দিরের দীপসজ্জা

মন্দিরদর্শনপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে মন্দিরের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিব যাহা দক্ষিণের প্রত্যেক মন্দিরেই দেখিয়াছি এবং যাহা উত্তরাপথের মন্দিরের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। বৈশিষ্ট্য মন্দিরের দীপসজ্জায়। শ্রীরঙ্গমে ইহা দেখিয়াছি, রামেশ্বরে দেখিয়াছি এবং ত্রিবান্দ্রমেও দেখিলাম। দীপমালার এমন অপূর্ব্ব সজ্জা অন্য কোথাও দেখি নাই। ইহার জন্য প্রদীপ বার বার বসাইতে হয় না। পিতলের প্রদীপ সারবন্দী করিয়া উপরে-নীচে বা পাশাপাশি করিয়া আঁটা। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহের দ্বারের উপরে ও দুই পার্শ্বে মালার মত সজ্জিত প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোকের পরিবেষ্টনী রচনা করিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে আরও প্রদীপ-রেখা শাখার আকারে বহির্গত হইয়াছে। সমস্তটা মিলিয়া যেন একটা আলোকের আল্পনা বলিয়া মনে হয়।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দুই সময়েই এই আলোকসজ্জার অপরূপ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার মধ্যে দেবতার প্রতি ভক্তির অভিব্যক্তির সহিত যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ তাহার তুলনা অন্যান্য মন্দিরে বিশেষ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ধর্মমন্দিরে মোমবাতির সজ্জাতেও কলাকৌশল আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দিরের এই আলোকসজ্জা সকলকে পরাভূত করে। মন্দিরের প্রথম স্থাপয়িতারা দেবতার প্রতি যে নিষ্ঠার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, অধুনাতন সেবকদের মধ্যে ভাবরাজ্যে তাহা কতদূর অক্ষুণ্ণ আছে জানি না; কিন্তু নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ যে তাহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, মন্দিরের দীপসজ্জা ও পুষ্পসজ্জা তাহার সাক্ষ্য দেয়।

(১১)

প্রত্যাবর্তন

পদ্মনাভ-দর্শনের সঙ্গে আমার ভ্রমণপরিকল্পনার পরিসমাপ্তি। এইবার ফিরিবার পালা। ত্রিবান্দ্রম্ হইতেই প্রত্যাবর্তনের যাত্রা আরম্ভ হইবে। এই কয়দিনের এককপরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণ হইতে বিদায় লইতেছি। আর আসা হইবে কিনা জানি না। তাঞ্জোর দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কাঞ্চী দেখিবার ইচ্ছা ছিল। সময়াভাবে তাহা বাকী রহিয়া গেল। মন ভারাক্রান্ত কিন্তু আর এক দিক দিয়া পরিপূর্ণ; গৃহে ফিরিতেছি। মনে হইতেছে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছি বহুদিন—"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী।" কাল প্রাতেই পৌঁছিয়া যাইব। ত্রিবান্দ্রম হইতে মাদ্রাজ পৌঁছিতে বৈকাল হইবে এবং মাদ্রাজ হইতে রাত্রি ১১টায় নৈশ বিমানে রওয়ানা হইয়া কাল ভোরেই কলিকাতায় পৌঁছিব। নৈশ বিমানের রিটার্ণ-টিকিট রহিয়াছে এবং সিট রিজার্ভ করিয়া রাখিবার জন্য কালই টেলিগ্রাম করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং এখন আর কোনো অনিশ্চয়তা নাই। এই কয় ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ সীমান্ত হইতে পূর্বপ্রান্তে পৌঁছিতেছি, ইহা ভাবিয়া কল্পনার মতো বোধ হইতে লাগিল। তথাপি বিমানের প্রভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে। রেলে যাইতে হইলে পাঁচ-ছয়দিন লাগিত।

ত্রিবান্দ্রমের আতিথ্য

মন্দির হইতে ফিরিয়া ত্রিবান্দ্রমে আমার অবস্থিতি কয়েকঘণ্টা মাত্র। কাল প্রাতে যখন ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছিলাম তখন মনের মধ্যে যে তিক্ততা জাগিয়াছিল তাহা বলিয়াছি। কিন্তু আজ আর তাহার লেশমাত্র ছিল না। গৃহস্বামী যুবকের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অদ্য বিদায়ের প্রাক্‌কালীন আতিথ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। গৃহস্বামীর পত্নী স্বয়ং রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইলেন। মহিলাটি বিশেষ উচ্চশিক্ষিতা। গৃহিণীকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া গৃহস্বামী বলিলেন— "আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন লক্ষ্মীলাভ হয়।" যুবকটির বিবাহ হইয়াছে কিছুকাল, কিন্তু সন্তান হয় নাই। তাহার কথার উত্তরে হাসিয়া তাহার গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলাম —"লক্ষ্মী তোমার গৃহে ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এইবার ষন্মুখমের শুভাগমন হোক।" মহিলা রন্ধন করিয়াছিলেন ভালই। একটা ব্যঞ্জনের কথা বিশেষ করিয়া বলিব। নারিকেল লম্বালম্বি কুঁচাইয়া বাঁধাকপির সহিত এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঁধাকপি আমাদের একটি প্রসিদ্ধ তরকারী এবং ইহার নানাপ্রকার সুস্বাদু রন্ধন বাঙলায় প্রচলিত। কিন্তু নারিকেল দিয়া বাঁধাকপির তরকারী একেবারেই নূতন। বাঙলার রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ইহা পরখ করিয়া দেখিতে পারেন।

ভালই হইবে। আমাদের বাঁধাকপি খাওয়া চৈত্র মাসের মধ্যেই অর্থাৎ এপ্রিলের মধ্যভাগেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু শুনিলাম, এখানে জুন মাস পর্যন্ত চলে। খাইতে খাইতে খাওয়া একটু বেশীই হইয়া গিয়াছিল। বিমানে উঠিতে যাইতেছি, এতটা খাওয়া উচিত ছিল না।

আহারের পর বিশ্রামের অবসর মিলিল না। কারণ দ্বিপ্রহরেই বিমান ছাড়ে। যেটুকু সময় ছিল, তাহার মধ্যে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইলাম। কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে স্যুটকেসে কয়েকখানি বস্ত্র ও অন্যান্য সামান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া কিছু ছিল না। ফিরিবার সময়ে দেখিলাম বহু বিচিত্র সংগ্রহে বাক্স বোঝাই। কাবেরীর জল, সেতুবন্ধের জল ও মৃত্তিকা, রামেশ্বরের চরণামৃত ও তিলকমাটি, তাহা ছাড়া প্রত্যেক মন্দিরের প্রসাদী ফুল স্তূপাকার হইয়া বাক্স ভরিয়া উঠিয়াছে। এতগুলি বস্তুকে সামলাইয়া লইয়া যাইবার দুর্ভাবনা তো আছেই। তাহা ছাড়া যাইতে হইবে বিমানে—বোঝার আধিক্য এক বিশেষ উদ্বেগ। কলিকাতা হইতে কোন বিছানাপত্র আনি নাই। তাহাতেই আমার বোঝাই-বৈচিত্র কলিকাতায় আনিয়া পৌঁছাইতে বেগ পাইতে হয় নাই।

পাদরীদের প্রভাব

বেলা বারটায় গৃহস্বামী আমাকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান অফিসে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া

বিদায় লইলেন। এখান হইতে কোম্পানীর গাড়িতে বিমান ঘাটিতে পৌঁছাইলাম। বিমানঘাটিটি একেবারে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে। এখানে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে, হইল যে, রাজ্যের বিধিতে নিষিদ্ধ কোন বস্তু লইয়া আসি নাই বা লইয়া যাইতেছি না। এখানে বসিয়া আর একটি বিশেষ জ্ঞান লাভ হইল—ত্রিবাঙ্কুরে তথা দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টান সমস্যার প্রাবল্য সম্বন্ধে। বিশ্রামকক্ষে কয়েকজন ইউরোপীয় পাদ্রীকে দেখিলাম। তাঁহারা বাহির হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের চালচলনে ও ভাবে প্রভুত্বের ভঙ্গী। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলেই বোধ হয় বেশ সম্পন্ন অবস্থায় ইঁহারা থাকেন এবং যথেষ্ট প্রভাব রাখেন। এই পাদ্রীগুলি ইংরাজ নহেন, ইঁহারা বেলজিয়ম হইতে আগত। শুনিলাম, পাদরী তৈয়ারী করিয়া বিদেশে পাঠানো বেলজিয়মের একটা বিশেষ কার্য। ইহাতে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারে সাহায্য করা তো হয় বটেই, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের নানাস্থানে দেশের লোকের কর্মসংস্থানেরও একটা ব্যবস্থা হয়। বলিতে পারি না, শেষেরটাই হয়তো বা আসল উদ্দেশ্য। ত্রিবান্দ্রমে গীর্জার সংখ্যাধিক্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যতগুলি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া গীর্জা ত্রিবান্দ্রমে বর্তমান।

বেলা একটায় বিমান ছাড়িল। আসিবার সময় পূর্ব উপকূল ধরিয়া আসিয়াছি। এবার চলিলাম পশ্চিম উপকূল

ধরিয়া। বিমান হইতে দেখা যাইতে লাগিল আরব সমুদ্রের নীল জল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। অতখানি উচ্চ হইতে ঠিক উপলব্ধি হইয়াছিল কিনা জানি না: মনে হইল, এ সমুদ্রে তরঙ্গ-ভঙ্গ তেমন প্রবল নহে। উর্দ্ধ হইতে দেখিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ জলের গতিতে বোঝা যায় না; বেলাভূমির উপর লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, জলের উপর স্তরে স্তরে চলনশীল শুভ্র রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে। তাহাতেই বোঝা যায়, ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পূর্ব সমুদ্রের উপর দিয়া আসিবার সময়ে ইহাই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু পশ্চিম সমুদ্রে তাহা তেমন চোখে পড়িল না। মনে হইল, জলরাশি শান্ত। অপরাহ্ণ বেলায় পদ্মার নিস্তরঙ্গ মূর্তিতে এক রকম অদ্ভুত প্রশান্তি ফুটিয়া ওঠে—অনেকটা সেই রকম। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন যে জলপ্রধান রাজ্য, বিমান হইতে তাহাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্র হইতে বড় বড় খাঁড়ী অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছে, আর অভ্যন্তর হইতে বহু স্থূল-সূক্ষ্ম বঙ্কিম জলরেখা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। ভূমির উপর যেন পুরু সবুজ পট বিছানো—কোথাও ঘন কোথাও ফিকা। পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া বিমানে যাইবার সময় নীচের দিকে চাহিলে এমনি সবুজের খেলা দেখা যায়। কোচিনের কুইলন বিমানঘাটি পর্যন্ত ইহা বিশেষভাবে দেখা গেল। ত্রিবান্দ্রম ছাড়িবার পর এই বিমান-ঘাটিতে বিমান নামিল এবং তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় উড়িল। দ্বিতীয় অবতরণস্থান কোয়েম্বাটুর; তৃতীয় অবতরণ-স্থান বাঙ্গালোর এবং তাহার পরই মাদ্রাজ।

ভৈরবের তাণ্ডব

কুইলন হইতে কোয়েম্বাটুর। বিমানকে একটা অঞ্চলের উপর দিয়া যাইতে হয়, যেখানে কেবল পর্বত ও উপত্যকা। ঘন-সন্নিবিষ্ট গিরিশ্রেণী গায়ে গায়ে জড়াইয়া দিকসীমা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে; যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল ধূসর ও কপিশের বিভিন্ন স্তরের বর্ণবিন্যাস উচ্চাবচ রেখায় তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে; ত্রিবান্দ্রম হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ রৌদ্রালোকে হাসিতেছিল: বিমান এই অঞ্চলের বায়ুস্তরে প্রবেশ করিবা-মাত্র সহসা মেঘসঞ্চারে গম্ভীর হইয়া উঠিল। নিম্নে গিরিরাজ্যে একটানা ধূসরতার আচ্ছাদন, তাহার উপরে স্তরে স্তরে সজ্জিত নিবিড় কৃষ্ণমেঘের স্তূপ ঊর্দ্ধলোক পর্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়াছে; মেঘস্তরের মধ্যদিয়া বিদ্যুতের রেখা বিমানকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্পিলগতিতে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিনাদ। বায়ুর বেগ প্রচণ্ড; তাহার পুনঃ পুনঃ আঘাতে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিমান কোনমতে অগ্রসর হইতেছে। কোনদিকে দৃষ্টি চলে না, তথাপি একান্ত আগ্রহে সেই দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আপনি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। আমার স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ভয়ঙ্করের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ নিগূঢ় হইয়া আছে। ভয়ঙ্করের সংস্পর্শ হইবামাত্র তাহা জাগিয়া ওঠে। বহুকাল পূর্বে একদা এক বৈশাখের অপরাহ্নে পদ্মার বক্ষে কালবৈশাখীর তাণ্ডব-নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সেই দৃশ্য মনে পড়িল। প্রলয়ের

দেবতার রুদ্র-ভৈরব রূপের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহার খানিকটা যেন আভাসে অনুভূত হইল; মনে হইল কুপিত রুদ্র-ভৈরবের জটাজাল নৃত্যবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, আর ললাট-নেত্র হইতে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা তাহারই তালে তালে বিচ্ছুরিত হইতেছে; দৃশ্যটি ভয়াল কিন্তু দেখিবার মত। স্তব্ধ ও শান্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া উহার রূপে ও অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইলাম।

কুইলন হইতে বাঙ্গালোরে পৌঁছিতে পথে একটা 'এয়ার পকেট', অর্থাৎ অসম বায়ুস্তর আছে শুনিয়াছি। প্রকৃতির এই আকস্মিক বিপর্যয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না। অসম বায়ুস্তরে পড়িলে বিমানের গতি ব্যাহত হইয়া অকস্মাৎ দ্রুত উঠানামা করিতে থাকে এবং যাত্রীদের বিশেষ অস্বস্তি হয়, এই পর্যন্তই জানি। বাঙ্গালোরে পৌঁছিতে পৌঁছিতে প্রকৃতির বিপ্লব কাটিয়া গেল—বাঙ্গালোরে যখন নামিলাম, তখন কেবলমাত্র আকাশে মেঘাবরণ বর্তমান—নিম্নের মৃত্তিকা সদ্য-বর্ষণে স্নিগ্ধ। মাদ্রাজে যখন পৌঁছিলাম, তখন আকাশ পুনরায় রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

আশা করিয়া আসিতেছিলাম বিমানঘাটিতে বন্ধুটিকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। কিন্তু বিমান হইতে নামিয়া দেখিলাম কেহ নাই। টেলিগ্রাম করিয়া আসিতেছিলাম, তথাপি বিমান-ঘাটিতে কাহাকেও না দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলাম; তাঁহাকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার অফিসে সংবাদ লইবার বিমান অফিসের কর্মচারীদের অনুরোধ জানাইলাম।

আমার পরিচয় পাইয়া কর্মচারীরা বলিলেন, তিনি পূর্বেই টেলিফোন করিয়াছেন এবং আমাকে কনেমারা হোটেলে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। তথায় তিনি আমার সহিত দেখা করিবেন। বিমানঘাটি হইতে বিমান-কোম্পানীগুলির যে সকল মোটর বাস যাত্রী লইয়া শহরে যাতায়াত করে, তাহারা কনেমারা হোটেলে থামে। সুতরাং তথায় পৌঁছিতে কোন অসুবিধা হইল না। পৌঁছিয়া দেখিলাম বন্ধুটি তখনও আসেন নাই। সন্ধান লইয়া জানিলাম, নৈশ বিমানের অফিস হোটেল হইতে সামান্যই দূরে। সুতরাং আমার আগমনবার্তা হোটেলের পরিচারকের নিকট জানাইয়া নৈশ বিমান অফিসে সন্ধান লইতে গেলাম। অফিসটি "মার্কারি ট্রাভেলস্" নামক কোম্পানীর। ভারত সরকারের নিকট হইতে নৈশ বিমান চালনার ভারপ্রাপ্ত 'হিমালয়ান এভিয়েশন' নামক কোম্পানীর হইয়া এই 'মার্কারী ট্রাভেলস্' কোম্পানী যাত্রী-যাতায়াত তত্ত্বাবধানের কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিলেন, আমার জন্য অদ্যকার নৈশ বিমানে কলিকাতা যাইবার স্থান রাখিতে মাদ্রাজের বন্ধুটি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন স্থান নাই। মাদ্রাজ হইতে যাইবার আসন ভর্তি, নাগপুর হইতে কলিকাতা যাইবার বিমানে আসন খালি থাকার কোন সংবাদ পাইলে তাঁহারা সে স্থান আমাকে দিতে পারেন। তাহাও রাত্রি নয়টার আগে বলিতে পারিবেন না। সেই সময় খোঁজ লইতে হইবে। তাঁহাদের কথা শুনিয়া নিতান্ত দমিয়া গেলাম। কাল ভোরেই কলিকাতা পৌঁছিব, মন আশায় ও

আনন্দে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপভাবে বাধা আসিতে পারে কল্পনা করি নাই। অফিসের কর্মচারীদের অনুরোধ-উপরোধ জানাইতেছি, এমন সময় মাদ্রাজের বন্ধুটি আমার সন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও অনুরোধে যোগ দিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি নয়টায় খোঁজ লইতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত কর্মচারীরা কিছু বলিতে সম্মত হইলেন না। তখনই তাঁহারা শেষ ও চূড়ান্ত খবর দিবেন।

বিমান বিভ্রাট

মাদ্রাজের বন্ধুটির গৃহে অতিথি হইলাম। যতটুকু সময় ছিলাম, তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত আনন্দেই কাটিয়াছিল। মাদ্রাজে যে শাসন চলিতেছিল, তাহার প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে বুঝিবার সুযোগ তাঁহার নিকট হইতে মিলিল। আহারাদি সারিয়া রাত্রি নয়টায় তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া বিমান অফিসে আসিলেন। আমার যাইবার প্রসঙ্গ আলাপ করিতে গিয়া দেখিলাম কর্মচারীরা উদাসীন। আজ দূরের কথা—আগামী কাল বা তৎপর দিনের নৈশ বিমানেও যে তাঁহারা আমাকে স্থান দিতে পারিবেন, সে ভরসা দিতে তাঁহারা অস্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম, ইহাতে বিমানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কারণ নৈশ বিমানের অপেক্ষা না করিয়া আমি যদি আজ মাদ্রাজ মেলে রওনা হইয়া যাইতাম তাহা হইলেও তৃতীয় দিনে কলিকাতা পৌঁছিতাম। কিন্তু যুক্তি দেখাইয়া কিছু লাভ হইল না। বসিয়া বসিয়া রাত্রি বাড়িতে

থাকিল। অবশেষে দেখিলাম, তাঁহাদের গাড়ি যাত্রী লইয়া বিমানঘাটিতে চলিয়া গেল। একজন কর্মচারী মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে আমরা থাকাতেই তিনি আটক হইয়া আছেন। অগত্যা হতাশ হইয়া উঠিতে হইল। তবে শেষ পর্যন্ত ইনি একটা অযাচিত পরামর্শ দিলেন, যাহা কাজে লাগিয়াছিল। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার কলিকাতাগামী বিমান প্রাতে মাদ্রাজ হইতে ছাড়ে। চেষ্টা করিলে তাহাতে হয়তো স্থান পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতায় দ্রুত ফিরিবার জন্য আমার ব্যাকুলতা বন্ধুটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লইয়া এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার অফিসে ছুটিলেন। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, অফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাত্রিটা বন্ধুটির গৃহে কাটাইলাম—অনিদ্রায় এবং উৎকণ্ঠায়। যাইবার উপায় হইতেছে না—সে উৎকণ্ঠা ছাড়া আর একটা বড় উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়াছিল। যাইবার সম্বল নাই। পকেটে রিটার্ণ টিকিট আছে—এই ভরসায় সঙ্গে আনীত অর্থ নিঃশেষে খরচ করিয়াছি। বিমান দূরের কথা, রেলের টিকিট কিনিবার মত অর্থও নাই। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার বিমানের ভাড়া কলিকাতা যাইতে দুইশত টাকা। একমাত্র ভরসা মাদ্রাজে নবপরিচিত এই মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি। এই সামান্য পরিচয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থী হওয়ার কথা চিন্তা করিতেও ক্লেশ হইতেছিল। অথচ উপায়ান্তর নাই। 'বচোজীবনয়োরাসীৎ পুরোনিঃসরণে রণঃ'—এই মানসিক অবস্থায় রাত্রি কাটিল। প্রচলিত বাক্যটির অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলাম—প্রার্থনার

বাক্য ও প্রাণ উভয়ই যেন কণ্ঠাগত ; কে আগে বাহির হইবে, তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব। বাক্য যেমনি বাহির হইতে চাহিতেছে, বাধা দিয়া প্রাণ বলিতেছে—তুমি থাকো, আমিই আগে বাহির হইয়া যাই। কিন্তু এত ভাবিয়াও কিছু হইল না। প্রাণ রহিল, বাক্যকেই বাহির হইতে হইল ; কথাটা বলিতেই হইল। প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার অফিসে ফোন করিয়া জানিলেন একজনের স্থান হইতে পারে, এখনি আসিয়া ঠিক করিতে হইবে। আমাকে ডাকিয়া লইয়া যখন বাহির হইবেন, তখন মুখ ফুটিয়া বলিলাম—"কিন্তু গিয়া করিব কি ? আমার তো হাতে টাকা নাই। ফিরিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত আছে জানিয়া যাহা আনিয়াছিলাম, নিঃশেষে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।" ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমারও তো হাতে টাকা নাই, আপনি কাল বলিলে আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম, কাল অফিসের মাহিনার দিন ছিল, কিন্তু আমার মাহিনা অবধি আনি নাই।" তখনকার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। তিনি ব্যস্ত হইয়া গৃহের মহিলা-মহলে এবং পার্শ্বে প্রতিবেশীর নিকট সন্ধান লইলেন—অর্থ মিলিল না। অবশেষে বলিলেন—"দেখুন, ভোরে উঠিয়া দরজা খুলিয়াই সম্মুখে সবৎসা গাভী দেখিয়াছি। ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। উপায় একটা হইবেই। চলুন বাহির হইয়া পড়ি।" তাহাই হইল। গতকল্য তাঁহার অফিসে যাহারা বেতন পাইয়াছে, তাহাদের একজনের গৃহে আমরা উপস্থিত হইলাম—টাকা মিলিল।

পুনরায় কলিকাতা

এই পর্ব করিতে কিছু দেরী হইয়া গেল। এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার অফিসে পৌঁছিতে তাঁহারা বলিলেন—স্থান যাহা খালি ছিল, ভর্তি হইয়া গিয়াছে, মাদ্রাজ হইতে যে কয়জন লইবার কথা ছিল, তাহা লওয়া হইয়া গিয়াছে। সুতরাং টিকিট হইবে না। অনেক পীড়াপীড়িতে তাঁহারা বিমান-ঘাটিতে যাইতে বলিলেন—বাঙ্গালোর হইতে বিমান আসিতেছে,—উহা কলিকাতায় যাইবে—যদি তাহাতে স্থান থাকে তো বিমানঘাটিতে গিয়া পাওয়া যাইতে পারে। অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। বিমানঘাটিতে আসিয়া কিন্তু কর্মচারীরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। স্থান আছে বুঝিলাম। কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহা লইয়াই সমস্যা। বন্ধুটি তাঁহাদিগকে ধরিয়া বসিলেন। অনেক কথাবার্তার পর শেষ পর্যন্ত তাঁহারাও রাজী হইলেন—মনে হইল বন্ধুটির পীড়াপীড়িতেই ইহা সম্ভব হইল। আশ্বস্ত হইলাম—উদ্বিগ্না জননীর কাছে আজই পৌঁছিতে পারিব,—ভোরে পৌঁছিব মনে করিয়াছিলাম,—দ্বিপ্রহর হইবে। তবে এবারকার বিমান-ভ্রমণ হইতে একটা শিক্ষা হইল—বিমানে ফিরতি টিকিট লইয়া কোথাও যাইলে, উপায়ান্তরে ফিরিবার মত অর্থ সকল সময়ে সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

ফিরিবার পথে বক্তব্য বেশী কিছু নাই—যাইবার সময় বঙ্গোপসাগর ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। এবার সে সুযোগ পাইলাম—দেখিলাম, অবিশ্রাম তরঙ্গ-ভঙ্গ এবং অগণিত ফেনশীর্ষ তরঙ্গের তটভূমিতে অবিরাম প্রক্ষেপ ; ক্রমে ভূমির উপর জল-

রেখার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—কর্দমাক্ত নদীস্রোত সমুদ্রে পড়িয়া বহুদূর পর্যন্ত ঘোলাইয়া তুলিতেছে দেখিয়া বুঝিলাম, বাঙলা দেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছি।

বিমান কলিকাতায় আসিল।*

---

* এই ভ্রমণকাহিনীটি খণ্ডে খণ্ডে সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় ১৯৫২ সালের ৫ই এপ্রিল (২৩শ সংখ্যা) হইতে ২৪শে মে (৩০শ সংখ্যা) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার শেষাংশে মাদ্রাজ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী পড়িয়া জনৈক পাঠক যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা কাহিনীলেখকের মন্তব্য সহ "দেশ" পত্রিকায় ১৪ই জুন তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনবোধে সেই পত্র ও মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইল—

"মহাশয়, বহুদিন ভারতের বাহিরে ছিলাম বলিয়াই বোধ হয় এদেশের বিবরণ যেখানে যেটুকু পাই পড়িয়া দেখি। সাপ্তাহিক "দেশ" কাগজে আপনার "দক্ষিণ ভারতে তীর্থভ্রমণ" অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছিলাম। আপনার বলিবার ভঙ্গী অতি মনোহর এবং পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিতেছি। মোট কথা, আপনাব রচনা খুবই ভাল লাগিতেছে। আপনি কলিকাতায় ফিরিলেন এবং গত সপ্তাহের "দেশে" আপনার কাহিনীও সমাপ্ত হইল।

ভ্রমণকাহিনী পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, অর্থসঙ্কটে পড়িয়া আপনাকে বাধ্য হইয়া এক নব পরিচিত মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সহায়তায় কলিকাতা আসিবার জন্য বিমানের টিকিট কিনিবার টাকার জোগাড় করিতে হইল। আপনি কলিকাতায় ফিরিয়াই যে উক্ত ভদ্রলোকের মারফৎ সংগৃহীত টাকা শোধ করিয়া দিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কথাটা আপনার ভ্রমণকাহিনীতে কেন উল্লেখ করিলেন না বুঝিতেছি না। যাহাতে কেহ ইহার কদর্থ করিতে না পারে তজ্জন্য অনুরোধ, টাকা শোধের কথা উহ্য না রাখিয়া পাঠকদের অবগতির জন্য "দেশ" কাগজের মারফৎ প্রকাশ করিয়া দিন। ইতি—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, হাজারীবাগ"

"পত্রলেখককে ধন্যবাদ। টাকাটা কলিকাতায় ফিরিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ভদ্রলোকে টাকা লইলে তাহা পরিশোধ করে ইহা স্বতঃসিদ্ধের মতই সকলে ধরিয়া লইবে এই ধারণাতেই ভ্রমণকাহিনীতে উহা উল্লেখ করা হয় নাই।—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য"